POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

এবং (তিনি তাহাকে আবির্ভূত করিবেন) তাহাদের মধ্য হইতে অন্য লোকের মধ্যেও যাহারা এখন পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই। এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। ইহা আল্লাহর ফযল, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন, এবং আল্লাহ্ পরম ফযলের অধিকারী। (জুমআ: ৩-৪)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 11-12

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 13-20 মার্চ, 2025 12-19 রমযান 1446 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

খোদা আমার প্রতি সহানুভূতি ও দয়ার আচরণ করিয়াছেন। এমন কি এই দীর্ঘ কালের প্রতিটি দিন আমার জন্য উন্নতির দিন ছিল। আমাকে ধ্বংস করার জন্য রুজুকৃত প্রতিটি মোকদ্দমায় খোদা দুশমনদেরকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন। যদি এই মেয়াদকালের এবং এই সাহায্য-সমর্থনের কোন দৃষ্টান্ত তোমাদের নিকট থাকে তবে তাহা পেশ কর নতুবা لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا আয়াতের দরুন এই নিদর্শনও প্রমাণিত হইয়া গেল। তোমাদিগকে এই ব্যপারে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

খোদা তা'লার কথা:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ○ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ○ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ○

অর্থাৎ যদি এই নবী কোন মিথ্যা কথা রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ করিত তাহা হইলে আমরা তাহাকে ডান হাতে ধৃত করিয়া তাহার জীবন শিরা নামক শিরা কাটিয়া দিতাম। যদিও এই আয়াত আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু ইহা সাধারণভাবে সকল নবীর জন্য প্রযোজ্য। যেমন সমগ্র কুরআন শরীফেও বাকধারা আছে যে, বাহ্যতঃ অধিকাংশ আদেশ-নিষেধের সম্বোধিত সত্তা আঁ হযরত (সা.) হইলেও এই সকল আদেশে অন্যরাও শরীক হইয়া থাকে, অথবা এই সকল আদেশ অন্যদের জন্যই হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ এই আয়াতের কথা উল্লেখ করা যায়। ○ فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا অর্থাৎ নিজের পিতা-মাতার সহিত কটু কথা বলিও না এবং এইরূপ কথা বলিও না যাহাতে তাহাদের সম্মানের প্রতি দৃষ্টি না থাকে। এই আয়াতে আঁ হযরত (সা.) কে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কালামের লক্ষ্যস্থল হইল উম্মত। কেননা, আঁ হযরত (সা.) এর পিতা ও মাতা তাঁহার শৈশবেই মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। এই আদেশের মধ্যে একটি রহস্যও আছে। তাহা এই যে, এই আয়াত দ্বারা একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারে যেক্ষেত্রে আঁ হযরত (সা.) কে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে, তুমি নিজ পিতা-মাতাকে সম্মান কর এবং সকল কথা বার্তায় তাহাদের সম্মানজনক পদ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখ,সেক্ষেত্রে অন্যদেরকে নিজেদের পিতা-মাতার কতখানি সম্মান করা উচিত। এই বিষয়ের প্রতি অন্য একটি আয়াত ইঙ্গিত করিতেছে। وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ (সূরা বনী ইসরাঈল: ২৪)। অর্থাৎ তোমাদের প্রভু চাহেন যে, তোমরা কেবল তাহাদেরই ইবাদত কর এবং তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। **এই আয়াতে** প্রতিমা পুজারীদিগকে,যাহারা প্রতিমা পূজা করে, বোঝানো হইয়াছে যে, প্রতি কোন বস্তুই নহে এবং তোমাদের উপর প্রতিমাদের কোন অনুগ্রহ নাই। ইহারা তোমাদিগকে জন্ম দেয় নাই এবং তোমাদের শৈশবে ইহারা তোমাদের অভিভাবকও ছিল না। যদি খোদা বৈধ রাখিতেন যে, তাঁর সাথে অন্য কাহারো পূজা করা প্রয়োজন হবে তবে এই আদেশ দিতেন যে, তোমরা পিতা-মাতার পূজা কর। কেননা, তাহারাও রূপকভাবে 'রব' (প্রতিপালক)। প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি এমন কি পশু-পাখীও নিজেদের সন্তানদেরকে উহাদের শৈশবে বিনষ্ট হওয়া হইতে রক্ষা করে। অতএব, খোদার রবুবীয়তের পর তাহাদের ও একটি রবুবীয়ত আছে এবং রবুবীয়তের এই আবেগ খোদা তা'লার পক্ষ হইতেই আসে।

এই প্রাসঙ্গিক বিষয়ের পর আমি আসল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিতেছি যে, আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে বলা হইয়াছে যদি সে আমাদের সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করিত তাহা হইলে আমরা তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিতাম- এই কথার অর্থ এই নহে যে, আল্লাহ্ তা'লা কেবল আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে নিজের এই আত্মাভিমান প্রকাশ করেন যে, যদি তিনি মিথ্যা রচনা করিতেন তবে তাঁহাকে ধ্বংস করিয়া দিতেন, কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে খোদার এই আত্মাভিমান নাই এবং খোদা সম্পর্কে অন্যরা যে যত মিথ্যা রচনা করুক না কেন ও মিথ্যা ইলহাম বানাইয়া খোদার প্রতি আরোপ করুক না কেন, তাহাদের উপর খোদার আত্মাভিমান ভড়কাইয়া উঠে না। এই ধারণা একদিকে যেমন অযৌক্তিক তেমনি অন্যদিকে খোদার সকল কেতাবের পরিপন্থীও। আজ পর্যন্ত তৌরাতেও এই কথা মজুদ আছে,যে ব্যক্তি খোদা সম্পর্কে মিথ্যা বানাইয়া বলিবে এবং নবুওতের মিথ্যা দাবী করিবে,তাহাকে ধ্বংস করা হইবে। এতদ্ব্যতীত শুরু হইতেই ইসলামের আলেমগণ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا (অর্থ: যদি এই নবী কোন মিথ্যা রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ করিত-অনুবাদক) আয়াতটি খৃষ্টান ও ইহুদীদের নিকট আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যবাদিতার জন্য দলিলস্বরূপ পেশ করিয়া আসিতেছেন। বলা বাহুল্য, যে পর্যন্ত কোন কথা সর্বব্যাপী না হয় তাহা দলিলরূপে গৃহীত হইতে পারে না। ইহা কি কোন দলিল হইতে পারে যে, আঁ হযরত (সা.) যদি মিথ্যা রচনা করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে ধ্বংস করা হইত এবং তাঁহার সকল কর্ম বিনষ্ট হইয়া যাইত; কিন্তু যদি অন্য কেহ মিথ্যা রচনা করে তবে খোদা অসন্তুষ্ট হন না, বরং তাহাকে ভালবাসেন,তাহাকে আঁ হযরত (সা.) এর চাইতেও অধিক অবকাশ দেন এবং তাহাকে সাহায্য ও সমর্থন করেন। ইহার নাম দলিল রাখা উচিত নহে। বরং ইহা তো একটি দাবি, যাহা নিজেই দলিলের মুখাপেক্ষী। আফসোস, আমার শত্রুতার জন্য এই লোকদের অবস্থা কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে যে,ইহারা আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যবাদিতার নিদর্শনাবলীর উপরও হামলা আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা জানে না যে, আমার এই ওহী ও ইলহামের কাল ২৫ বৎসরের অধিক অতিবাহিত হইয়াছে,আঁ হযরত (সা.)-এর নবুওতের যুগের চাইতেও অধিক। কেননা, উহা ছিল ২৩ বৎসর এবং ৩০ বৎসরের কাছাকাছি। এখনো জানি না খোদা তা'লার জ্ঞানে আমার দাবী-কালের ধারা কবে পর্যন্ত জারি থাকিবে। এইজন্য মৌলবী বলিয়া কথিত এই সকল লোক এই কথা বলে যে, খোদা সম্পর্কে মিথ্যা রটনাকারী ও মিথ্যা ইলহামের দাবীদার মিথ্যা রচনার শুরু হইতে ত্রিশ বৎসর পর্যন্তও জীবিত থাকিতে পারে এবং খোদা তাহাকে সাহায্য ও সমর্থন করিতে পারেন। কিন্তু তাহারা ইহার কোন দৃষ্টান্ত পেশ করে না। হে দুঃসাহসী লোকেরা! মিথ্যা বলা আবর্জনা খাওয়ার সমান। খোদা আমার প্রতি সহানুভূতি ও দয়ার আচরণ করিয়াছেন। এমন কি এই দীর্ঘ কালের প্রতিটি দিন আমার জন্য উন্নতির দিন ছিল। আমাকে ধ্বংস করার জন্য রুজুকৃত প্রতিটি মোকদ্দমায় খোদা দুশমনদেরকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন। যদি এই মেয়াদকালের এবং এই সাহায্য-সমর্থনের কোন দৃষ্টান্ত তোমাদের নিকট থাকে তবে তাহা পেশ কর নতুবা لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا (অর্থ: যদি এই নবী কোন মিথ্যা রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ করিত-অনুবাদক) আয়াতের দরুন এই নিদর্শনও প্রমাণিত হইয়া গেল। তোমাদিগকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইবে। (হাকীকাতুল ওহী,রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২. পৃ: ২১৩)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

অন্যায়ের সূচনা কাফিরদের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। যারা কোনো বৈধ কারণ ছাড়াই কেবল ইসলামের শত্রুতায় নিরপরাধ মুসলমানদের সাথে এধরনের নির্দয় ও বর্বর আচরণ করেছিল। আর তাদেরকে যে শাস্তিই দেওয়া হয়েছে তা কেবল প্রতিশোধমূলক ও প্রত্যুত্তরমূলক ছিল।

(সীরাত খাতামান্নবীঈন)

মহানবী (সা.) এরপর কখনো কারো চোখে শলাকা বিদ্ধ করেন নি, কারও জিহ্বা কাটেন নি আর হাত-পা কাটার চেয়ে গুরুতর কোনো শাস্তি দেন নি। এরপর তিনি (সা.)যে সেনাদল-ই প্রেরণ করেন, তাদেরকে (মরদেহের) অঙ্গচ্ছেদ করতে বারণ করেছেন।

মহানবী (সা.) যা-ই করেছেন তা কেবল প্রতিশোধমূলক ও পাল্টা আক্রমণ ছিল, যা ইসলামী বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মুসায়ী শরীয়তের (বিধান) অনুসারে কার্যকর করা হয়। কিন্তু এর অনতিপরেই ইসলামী বিধান অবতীর্ণ হয়। আর তাতে এ ধরনের প্রতিশোধমূলক শাস্তি প্রদানকেও অবৈধ ঘোষণা করা হয়।

সার্বিক পরিস্থিতি দৃষ্টিপটে রেখে লক্ষ্য করা হয় তাহলে এ ঘটনায় ইসলামের আঁচল সম্পূর্ণ পবিত্র দৃষ্টিগোচর হয়। কেননা এই সিদ্ধান্ত মূলত ইসলামের (সিদ্ধান্ত) ছিল না, বরং হযরত মূসা (আ.)-এর(সিদ্ধান্ত) ছিল, যাঁর শরীয়তকে হযরত ঈসা (আ.) বাতিল করেন নি, বরং বহাল রেখেছিলেন। আরনিয়্যীনের এই ঘটনাটি (কুরআনের) সীমাতিক্রম না করার আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। কুরয্ বিন জাবের (রা.) এবং যি কারদ সেনাভিযানের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ২৪ শে জানুয়ারী, ২০২৫, **এর জুমুআর খুতবা (২৪ সুলাহ, ১৪০৪ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, তাশাহহুদ, তা'উয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.)বলেন, মহানবী (সা.)-এর যুগের বিভিন্ন সারিয়্যা বা সেনাভিযানের উল্লেখ করা হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায় আজ প্রথমে কুরয্ বিন জাবের (রা.)-র (সেনাভিযানের) উল্লেখ করব। এই সেনাভিযান ৬ষ্ঠ হিজরীর শওয়াল মাসে উরানিজীনের দিকে সংঘটিত হয়েছিল।

(তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭১)

কারো কারো মতে, এই সেনাভিযান ছিল সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-র। কিন্তু অধিকাংশের বক্তব্য হলো, এই সেনাভিযানটি কুরয্ বিন জাবের (রা.)-র ছিল। এছাড়া একটি ভাষ্য এমনওরয়েছে যে, (এটি) জারীর বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)-র ছিল; তবে এই বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যানও করা হয়েছে। জারীর বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) এই সেনাভিযানের চার বছর পর মুসলমান হয়েছিলেন।

(সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬০)

এই সারিয়্যা বা সেনাভিযানের কারণ হলো, মহানবী (সা.)-এর নিকট কয়েকজন মানুষ আসে। বুখারী (শরীফের) কিতাবুল জিহাদ ও কিতাবুদ্ দিয়াত-এ হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, সেই আটজন উক্ল এবং উরায়না গোত্রের ছিল। ইবনে জারীর ও আবু আওয়ানা (রা.)-র মতে, উরায়না গোত্র থেকে চারজন, উক্ল গোত্র থেকে তিনজন এবং অষ্টম ব্যক্তি এ দুই গোত্রভুক্ত ছিল না। তার বংশপরিচয় জানা নেই। অতএব, তারা মহানবী (সা.)-এর নিকট আসে এবং ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করে। আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে, তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে; তবে তারা অসুস্থ ছিল। আবু আওয়ানা (রা.) বর্ণনা করেন, তারা (শারীরিকভাবে) খুবই দুর্বল ছিল আর তাদের গায়ের রঙ অত্যধিক হলুদাভ ছিল এবং তাদের পেট বড়ো ছিল। তারা বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদেরকে আশ্রয় দিন এবং আমাদের আহার করান। তারা মসজিদে নববীর বারান্দায় অবস্থান করছিল। অতঃপর তারা যখন আরোগ্য লাভ করে তখন মদীনার আবহাওয়া তাদের শরীরের জন্য উপযুক্ত ছিল না। অর্থাৎ ক্ষুধার (যন্ত্রণার) কারণে যেঅসুস্থতা ও দুর্বলতা ছিল তা দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু সার্বিকভাবে মদীনার আবহাওয়া, অর্থাৎ শহুরে আবহাওয়া তাদের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত ছিল না। ইবনে ইসহাকের মতে, তারা (মদীনার) আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে দুর্বল হয়ে পড়ে। যদিও তারা একদিক থেকে ক্ষুধার কারণে সৃষ্ট দুর্বলতা কাটিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু অপরদিকে অন্যান্যরোগ-ব্যাধি দেখা দেয়। যাহোক, একটি রেওয়ায়েতে আছে, সেই দিনগুলোতে মদীনায় একটি মহামারি দেখা দেয়; যেটিকে বিরসাম বলা হয়। বিরসাম একটি রোগ যা মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে আর মাথায় ও বক্ষে ফোসকা পড়ে। তারা বলে, এই রোগ এখানে পৌঁছেগিয়েছে আর মদীনার আবহাওয়াও আমাদের জন্য অনুপযুক্ত। আমরা পশুপালন করি, আমরা কৃষিজীবি নই; আমাদের জন্য দুধের ব্যবস্থা করে দিন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমার কাছে আর তো কিছু নেই, কিন্তু তোমরা দুগ্ধবতী উটনীগুলোর কাছে চলে যাও; এবং তাদেরকে চারণভূমিতে পাঠিয়ে দেন। একটি রেওয়ায়েতে আছে, মহানবী (সা.) তাদেরকে ফ্যায়ফাউল খাবার-এর রাখালদের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ফ্যায়ফাউল খাবার মদীনার নিকটবর্তী একটি মরুভূমি ছিল।

যাহোক, এই রেওয়ায়েত থেকে এটিই প্রতীয়মান হয়, তারা মদীনায় বেশি দিন অবস্থান করে নি, বরং তাড়াতাড়ি মদীনার বাইরে চলে যায় আর উটনীর দুধ পান করে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। অপর এক রেওয়ায়েতে এটিও এসেছে যে, মহানবী (সা.) তাদেরকে সদকার উটনীর পালের নিকট যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন যেন তারা সেসব উটনীর দুধ পান করতে পারে। অতএব, তারা উটনীগুলোর কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ পান করে। অতএব, তারা যখন আরোগ্য লাভ করে এবং তাদের দেহ পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে আর তাদের পেট ছোট হয়ে আসে, তখন তারা ইসলাম গ্রহণের পর কাফির হয়ে দুগ্ধবতী উটনীগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়।

একদিকে ছিল মহানবী (সা.)-এর সহানুভূতি আর অপরদিকে তাদের এই আচরণ, অর্থাৎ সুস্থ হওয়ার পর তারা ধোঁকা দেয়। কথিত আছে,মহানবী (সা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস ইয়াসার এবং তার কতিপয় সঙ্গী যখন তাদেরকে ধরে ফেলেন। (অর্থাৎ তারা যখন উটনীগুলো নিয়ে চলে যাচ্ছিল বা উটনীগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন। অর্থাৎ, কাফির হয়ে দুগ্ধবতী উটনীগুলোকে নিজেদের সাথে নিয়ে যাওয়ার সময়।) যাহোক, মুসলমানরা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বা আটক করে তখন তারাও পাল্টা আক্রমণ করে, তারাও (মুসলমানদের সাথে) লড়াই করে। অতএব, এরা ইয়াসার (রা.)-রহাত ও পা কেটে এবং তার জিহ্বা ও চোখে কাঁটা বিদ্ধ করে, পরিণামে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। এরা যারা এসেছিল; অর্থাৎ যারা ডাকাতি করে অথবা চুরি করে উটনীগুলো নিয়ে গিয়েছিল, তারা মুসলমানদের যে রাখাল

ছিলেন তার সাথে লড়াই করে তাকেও হত্যা করে। এরপর তারা রাখালদের দিকে এগিয়ে যায়,(প্রথমে তো ইয়াসারকে হত্যা করেছিল),এরপর বাকি রাখালদেরও হত্যা করে। এক ব্যক্তি তাঁর (সা.) সকাশে উপস্থিত হয় এবং বলে, তারা আমার সাথীকে হত্যা করেছে। তাদের মধ্যে একজন প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলেন, তারা উটগুলো নিয়ে চলে গেছে।

মুহাম্মদ বিন উমর (রা.)-র রেওয়ায়েত হলো, বনু আমর বিন অওফ (গোত্রের)একজন নারী নিজের গাধায় ওপরে আরোহণ করে এদিকে আসে এবং ইয়াসার (রা.)-রপাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তিনি তখন গাছের নীচে পড়ে ছিলেন। সেই (নারী) যখন তারপাশ দিয়ে যাচ্ছিল ততক্ষণে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। সেই (মহিলা) তার জাতির লোকদের কাছে ফিরে যায় এবং তাদেরকে এই ঘটনা অবগত করে। অতএব তারাও বের হয়,এমনকি ইয়াসার (রা.)-কে মৃত অবস্থায় তুলে কুবায় নিয়ে আসে।

সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েত হলো, মহানবী (সা.)-এর নিকট আনসারের কুড়িজন যুবক উপস্থিত ছিল। তিনি (সা.) তাদেরকে প্রেরণ করেন। একটি রেওয়ায়েতে আছে,মহানবী (সা.) তাদের পদচিহ্নের অনুসরণে কুড়িজন অশ্বারোহীকে প্রেরণ করেন। অর্থাৎযখন তারা (উট) নিয়ে চলে গিয়েছিল এবং তিনি (সা.) সংবাদ পান, তখন তিনি (সা.)তাদের পশ্চাদ্ধাবনে বিশজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন, তাদেরকে ধরে আনার জন্য। তাদের মধ্যে কয়েকজনের নামও লেখা হয়েছে। যাদের মধ্যে সালমা বিন আকওয়া, আবু রুহুম, আবু যার গিফারী, বুরাইদা বিন হুসায়েব, রাফে' বিন মাকীস এবং তার ভাই জুনদুব বিলাল বিন হারেস, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন অওফ মুযানি, জুয়াল বিন সুরাকা সা'লবী, সুআয়েদ বিন সাখার জুহনী (রা.) প্রমুখ। তারা সবাই মুহাজির ছিলেন এবং কুরযান বিন জাবেরফেহরী (রা.)-কে তাদের নেতা মনোনীত করেন। মহানবী (সা.) তাদেরকে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করেন। তাদের সাথে তিনি একজন খোঁজীও প্রেরণ করেন, যে তাদের বিভিন্ন চিহ্নের সন্ধান করতো। আর তিনি (সা.) সেসব শত্রুর বিরুদ্ধে বদ্‌দোয়া করেন এবংবলেন, হে আল্লাহ্! তাদের পথ ভুলিয়ে দাও এবং তা তাদের জন্য উটের চামড়ার চেয়েও সরু করে দাও। অর্থাৎ, তারা যেন সফর করতে না পারে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা তাদের পথ ভুলিয়ে দেন এবং তারা সেদিনই আটক হয়। সকাল হলে তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিয়ে আসা হয়। (যে কুড়িজন গিয়েছিলেন তারা তাদেরকে বন্দি করে নিয়ে আসেন।) একটি রেওয়ায়েতে আছে, কুরয বিন জাবের (রা.) ও তার সঙ্গীরা তাদের সন্ধানে বের হন, এমনকি রাত হয়ে যায়। অতএব, তারা হাররাতে রাত্রিযাপন করেন। এরপর সকাল হয়, অথচ তারা এটি জানতেন না যে, তারা (শত্রুরা) কোথায় গিয়েছে? হঠাৎ তারা একজন মহিলাকে দেখেন, যে উটের রান বহন করছিল। অতএব, তারা তাকে আটক করেন এবং সেই মহিলাকে জিজ্ঞেস করেন, এটি কী? সেই মহিলা বলে, আমি একদল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি; তারা উট জবাই করেছিলো। তারা আমাকে এই রানটি দিয়েছে এবং তারা এই জঙ্গলে রয়েছে। (অর্থাৎ, তাকেও মাংসের কিছু টুকরো দিয়েছিল, পায়ের বা রানের উপরিভাগের অংশ।) সে বলে, তোমরা যখন তাদেরকে দেখবে তখন তাদের (রান্নার) ধোঁয়া দেখতে পাবে। (তারা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে।)

অতএব, তারা অর্থাৎ সাহাবীরা অগ্রসর হন এবং এমন সময় তাদের নিকট পৌঁছেন যখন তারা খাওয়া-দাওয়া শেষ করেছিল। সাহাবীরা তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বললে (তারা) সবাই আটক হয় এবং তাদের মধ্য থেকে একজনও অবশিষ্ট ছিল না। এরপর সাহাবীরা তাদেরকে বেঁধে ফেলেন এবং নিজেদের ঘোড়ার পেছনে বসিয়ে তাদেরকে মদীনায় নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) তখন রাগাবা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। রাগাবা ছিল জুরফের নিকটবর্তী একটি জায়গা আর জুরফ মদীনা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল।

যাইহোক, তারা (সাহাবীরা) তাদেরকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি তাদের পেছনে কয়েকজন যুবককে নিয়ে রওয়ানা হই, এমনকি মহানবী (সা.) রাগাবা উপত্যকায় পানির প্রবাহ জমা হওয়ার স্থানে তাদের সাথে মিলিত হন। তখন মহানবী (সা.) লোহার শলাকা নিয়ে আসার নির্দেশ দেন আর তা গরম করা হয়, তারপর মহানবী (সা.) লোহার শলাকাগুলো তাদের চোখে বিদ্ধ করেন, কেননা তারা (মুসলমান) রাখালদের চোখে শলাকা বিদ্ধ করেছিল। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর নিকট নিয়ে আসা হলে তিনি (সা.) তাদের এক পাশের হাত কাটেন এবং বিপরীত দিকের পা কেটে দেন আর তাদের চোখে গরম শলাকাবিদ্ধ করে তাদেরকে সূর্যের তাপে ফেলে রাখেন, এমনটি তাদের (মধ্যে) দুজন মারা যায়। অন্য আরেকটি রেওয়াতে আছে, তাদের চোখে গরম শলাকা বিদ্ধ করা হয় আর তাদেরকে সূর্যের তাপে ফেলে রাখা হয়। তারা পানি চাইতো, কিন্তু তাদের পানি দেওয়া হতো না। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি তাদের মধ্য হতে একজনকে দেখি, যে প্রচণ্ড তৃষ্ণার কারণে মুখ দিয়ে জিহ্বা চুষছিল; যাতে সে (কিছুটা) শীতলতা অনুভব করে। তীব্র গরম এবং রোদের তাপের কারণে সে মারা যায়। আর তার রক্তপাত বন্ধের জন্য কোনো পট্টি বাঁধা হয়নি, (তার কোনো চিকিৎসা করা হয়নি।) আবু কিলাবা (রা.) বর্ণনা করেন, তারা এমন মানুষ ছিল, যারা হত্যা করেছে, চুরিও করেছে, এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর কাফির হয়ে গিয়েছিল আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিল।

ইবনে সীরীন বর্ণনা করেন, আরনিয়্যীনের এই ঘটনাটি (কুরআনের) সীমাতিক্রম না করার আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। যাহোক, এসব ঘটনা ঘটেছিল। বাহ্যত মনে হয়, মুসলমানরা অনেক অবিচার করেছিল, কিন্তু ইসলামের যে শিক্ষা তা পরবর্তীতে অবতীর্ণ হয় আর তা হলো, আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدہ:34)

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়, নিশ্চয় তাদের শাস্তি হলো, তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হোক বা ক্রুশবিদ্ধ করে মারা হোক অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হোক কিংবা তাদেরকে নির্বাসিত করা হোক। এটি হলো ইহকালে তাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং পরকালেও রয়েছে তাদের জন্য এক মহা-শাস্তি।(সূরা আল্ মায়েদা-৩৪)

মহানবী (সা.) এরপর কখনো কারো চোখে শলাকা বিদ্ধ করেন নি, কারও জিহ্বা কাটেন নি আর হাত-পা কাটার চেয়ে গুরুতর কোনো শাস্তি দেন নি। এরপর তিনি (সা.)যে সেনাদল-ই প্রেরণ করেন, তাদেরকে (মরদেহের) অঙ্গচ্ছেদ করতে বারণ করেছেন।এরপর তিনি (সা.) তাদেরকে সদকা প্রদানে উৎসাহিত করতেন এবং অঙ্গচ্ছেদ করতে বাধা দিতেন।মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াকদী এবং ইবনে সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন, পনেরটি উটনী ছিল যা তারা চারণভূমি থেকে (চুরি করে) নিয়ে গিয়েছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১১৫-১১৭) (মুজামুল বুলদান, পৃ: ২৬৩)

যাইহোক, শত্রুরা মুসলমানদের সাথে এমন (নিষ্ঠুর) আচরণ করেছিল যার দরুন তাদের বিরুদ্ধে এই প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল; ঠিক সেভাবেই যেমনটি তারা করেছিল, আর তদ্রুপ শাস্তিই দেওয়া হয়। কিন্তু এরপর ইসলামী শিক্ষানুযায়ী আর কখনো শত্রুদের সাথে এমন আচরণ করা হয়নি। যদিও এটি-ই এর উত্তর, কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিকারীদের কারো কারো আপত্তি, শত্রুদের সাথে কেন এমন পাশবিক আচরণ করা হলো? এর কিছুটা বিস্তারিত উত্তর হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে খুবই চমৎকারভাবে প্রদান করেছেন। তিনি লিখেন, 'মুসলমানদের জন্য সেই দিনগুলো ছিল খুবই ভীতিকর, কেননা কুরাইশ এবং ইহুদীদের উস্কানিতে গোটা দেশ তাদের শত্রুতার আগুনে জলছিল। আর নিজেদের নিত্যনতুন দুরভিসন্ধির আলোকে তারা এই সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছিল যে, মদীনায় রীতিমত আক্রমণ করার পরিবর্তে চোরাগোপ্তা (হামলা করে) ক্ষতি সাধন করা হোক। যেহেতুপ্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতা আরবের হিংস্র গোত্রগুলোর চারত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল, এজন্য তারা সকল বৈধ ও অবৈধ পন্থায় মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে উঠে পড়ে লেগেছিল। কাজেই, (যে ঘটনা বর্ণনা করতে যাচ্ছিলেন; সেই ঘটনাই উল্লেখ করেন)। এটি সেই অপকর্মের-ইএকটি ধারা ছিল যা পরিণামে এক ভয়ানকরূপে প্রদর্শিত হয়। তিনি (রা.) আরও লেখেন,এর বিশদ বিবরণ হলো, ৬ষ্ঠ হিজরীর শওয়াল মাসে উক্‌ল ও উরায়না গোত্রের কয়েকজন সদস্য, যারা সংখ্যায় ছিল ৮জন, মদীনায় আসে এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ওঅনুরাগ প্রকাশ করে মুসলমান হয়ে যায়। কিছু দিন অবস্থানের পর মদীনার আবহাওয়াতে তাদের উদর ও প্লীহা প্রভৃতির বিভিন্ন কষ্ট দেখা দেয়, এবং এই অজুহাতে (তারা) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় আর নিজেদের দুর্ভোগের বা কষ্টের কথা উল্লেখ করে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা মরুবাসী এবং গবাদি পশুদের সাথে বসবাস

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: Sayen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

করে জীবন কাটিয়েছি, আর শহুরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত নই– তাই অসুস্থ হয়ে পড়েছি। মহানবী (সা.)বলেন, তোমাদের যদি এখানে মদীনায় কষ্ট হয় তাহলে মদীনার বাইরে যেখানে আমাদের গবাদি পশুগুলো থাকে– সেখানে চলে যাও। (আতিথেয়তার দায়িত্ব পালন করেন, স্নেহসুলভ ব্যবহার করেন।) উটের দুধ ইত্যাদি পান করতে থাকো। সেখানে স্বাস্থ্যকর জায়গায় থেকে আরোগ্য লাভ করবে। একটি রেওয়ায়েতে আছে, তারা নিজেরাই বলেছিল ,হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিলে আমরা মদীনার বাইরে যেখানে আপনার গবাদি পশু থাকে, সেখানে চলে যাবো। তিনি (সা.) এর অনুমতি প্রদান করেন। যাহোক, তারা মহানবী (সা.)–এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মদীনার বাইরে সেই চারণভূমিতে চলে যায়, যেখানে মুসলমানদের উট থাকত।

এই দুর্ভাগারা যখন সেখানে নিজেদের অবস্থান পোক্ত করে এবং অগ্র-পশ্চাৎ দেখে পুরো পরিবেশ–পরিস্থিতি যাচাই করে নেয়, আর মুক্ত বাতাসে থেকে এবং উটনীর দুধ পান করে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়, তখন একদিন অকস্মাৎ উটের রাখালদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে হত্যা করে। আর এমন নির্দয়ভাবে হত্যা করে যে, প্রথমে (তাদেরকে) পশুরমতো জবাই করে। এরপর যখন (তাদের মাঝে) সামান্য প্রাণ অবশিষ্ট ছিল তখন তাদের জিহ্বায় মরুভূমির তীক্ষ্ম কাঁটা বিদ্ধ করে দেয়, যাতে তারা যদি মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের করে অথবা পিপাসায় কাতর হয় তখন এই কাঁটা তাদের কষ্টের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করবে। অতঃপর, এই পাষণ্ডরা এতেই ক্ষান্ত হয় নি বরং গরম শলাকা নিয়ে এই মৃতপ্রায় মুসলমানদের চোখে বিদ্ধ করে। আর এভাবে এই নিরপরাধ মুসলমানরা উন্মুক্ত প্রান্তরে ছটফট করতে করতে প্রাণ হারায়। তাদের মাঝে মহানবী (সা.)–এর একজন ব্যক্তিগত সেবকও ছিলেন, যার নাম ছিল ইয়াসার, যিনি মহানবী (সা.)–এর উট দেখাশোনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।

এই পাষণ্ডরা এমন নিষ্ঠুরভাবে মুসলমানদের হত্যা করার পর সবগুলো উট জড়ো করে সেগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। একজন রাখাল মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে এই পরিস্থিতি অবগত করেন, যিনি ঘটনাক্রমে প্রাণে বেঁচে পালিয়ে এসেছিলেন। তখন তিনি(সা.) তৎক্ষণাৎ বিশজন সাহাবীর একটি দল গঠন করে তাদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করেন।যদিও এই লোকেরা অর্থাৎ, শত্রুরা ইতঃমধ্যে কিছুটা দুরত্ব অতিক্রম করে ফেলেছিল কিন্তু খোদা তা'লা অনুগ্রহ করেন যে, মুসলমানরা ত্বরিত গতিতে পিছু ধাওয়া করে তাদেরকে ধরে ফেলেন এবং রশি দিয়ে বেঁধে (মদীনায়) ফিরিয়ে আনে। তখনও পর্যন্ত মহানবী (সা.)–এর প্রতি এ মর্মে কোনো আদেশ অবতীর্ণ হয় নি যে, কেউ এ ধরনের অপরাধ করলে তার সাথে কী ব্যবহার করা উচিত। তাই মহানবী (সা.) তাঁর অনুসৃত রীতি অনুযায়ী অর্থাৎ,'যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামে কোনো নতুন আদেশ অবতীর্ণ না হতো ততক্ষণ পর্যন্ত আহলে–কিতাবের বিধান অনুসরণ করা উচিত'– এই নীতি অবলম্বন করতেন। মূসায়ী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নির্দেশ প্রদান করেন যে, ঐ পাষণ্ডরা মুসলমান রাখালদের সাথে যেমন ব্যবহার করেছে, তাদের সাথেও প্রতিশোধমূলক এবং প্রত্যুত্তরমূলক ব্যবহার করা হোক। [এটি হযরত মূসা (আ.)–এর শিক্ষা ছিল এবং যতদিন পর্যন্ত শরীয়তের বিধিনিষেধ পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হয় নি ততদিন পর্যন্ত তদনুযায়ী আমল করা হতো]। যাহোক, এটি এ কারণে করা হয় যাতে এই শাস্তি অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে যায়। কাজেই, সামান্য পরিবর্তনসহ সেভাবেই মদীনার বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তরে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। কিন্তু ইসলামের জন্য খোদা তা'লা অন্য এক বিধান নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। যেমন, পরবর্তীতে পাল্টা আক্রমণ এবং প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রেও মুসলা'র (তথা মৃতের অঙ্গচ্ছেদের) শাস্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ, এ বিষয়টি অবৈধ আখ্যা দেওয়া হয় অর্থাৎ যেকোনো পরিস্থিতিতেই মরদেহ বিকৃত করা অথবা প্রতিশোধমূলকভাবে মৃতদেহ খণ্ডবিখণ্ড করা ইত্যাদি (অবৈধ আখ্যা দেওয়া হয়)।

এ ঘটনা সম্পর্কে তিনি (রা.) লিখেন, এ সম্পর্কে আমার বেশি কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। কেননা, এ ঘটনায়, অন্যায়ের সূচনা কাফিরদের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। যারা কোনো বৈধ কারণ ছাড়াই কেবল ইসলামের শত্রুতায় নিরপরাধ মুসলমানদের সাথে এধরনের নির্দয় ও বর্বর আচরণ করেছিল। আর তাদেরকে যে শাস্তিই দেওয়া হয়েছে তা কেবল প্রতিশোধমূলক ও প্রত্যুত্তরমূলক ছিল। [অর্থাৎ শত্রুদের যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তা কেবল কিসাস (তথা প্রতিশোধমূলক) ছিল। আর এই শাস্তি এমন সময়ে কার্যকর করা হয় যখন ইসলামের বিরুদ্ধে গোটা দেশ শত্রুতা ও বিরোধিতার আগুনে দাউদাউ করে জ্বলছিল।] আর এ সিদ্ধান্তও মূসা (আ.)–এর বিধান অনুযায়ী কার্যকর করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ইসলাম এই বিধানকে বহাল রাখে নি বরং ভবিষ্যতে এই রীতি অনুসরণ করতে বারণ করা হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ (সিদ্ধান্তের) বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করতে পারে না। এক্ষেত্রে একথাও স্মরণ রাখতে হবে, এরা শুরু থেকেই দুষ্কৃতির অভিপ্রায়ে মদীনায় এসেছিল। সম্ভবত তারা তাদের গোত্র দ্বারা প্রশিক্ষিত ছিল–তারা যেন মুসলমানদের মাঝে অবস্থান করে মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করে। মহানবী(সা.)–এর বিরুদ্ধেও হয়ত তারা (হত্যার) কোনো চক্রান্ত করে থাকতে পারে। কিন্তু মদীনায় অবস্থান করে তারা যখন কোনো সুযোগ খুঁজে পায়নি তখন তারা ষড়যন্ত্র করে যে, মদীনার বাইরে গিয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

তাদের এহেন দুরভিসন্ধি এ ঘটনা থেকে প্রতিভাত হয় যে, তারা মুসলমান রাখালদের সাথে যে ব্যবহার করেছে তা কোনো (সাধারণ) চোর কিংবা ডাকাতদের আচরণ ছিল না বরং সুস্পষ্ট প্রতিহিংসামূলক ছিল। শুরুতেই তারা যদি আন্তরিকভাবে মুসলমান হয়ে থাকত আর পরবর্তীতে উট দেখে তাদের সংকল্প পরিবর্তন হয়ে গিয়ে থাকত, তাহলে এমতাবস্থায় তারা উট নিয়ে পলায়ন করতে পারতো। আর যদি কোনো রাখাল তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতো তাহলে তারা সর্বোচ্চ তাকে হত্যা করে পালিয়ে যেত। কিন্তু তারা যেভাবে মুসলমান রাখালদেরকে হত্যা করেছে আর নিজেদেরকে বিপদের মুখে ফেলে হত্যার নৃশংসতাকে দীর্ঘায়িত করেছে, [ঘটনার পর সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে] এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ে হত্যা করেছে, এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, তাদের এই কর্ম কোনো অকস্মাৎ লালসার পরিণাম ছিল না বরং সুস্পষ্টভাবে প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ ছিল এবং হৃদয়ের বিদ্বেষও দীর্ঘদিনের লালন করা ঘৃণার বহির্প্রকাশ ছিল। আর তাদের এরূপ বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডের প্রত্যুত্তরে মহানবী (সা.) যা–ই করেছেন তা কেবল প্রতিশোধমূলক ও পাল্টা আক্রমণ ছিল, যা ইসলামী বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মূসায়ী শরীয়তের (বিধান) অনুসারে কার্যকর করা হয়। কিন্তু এর অনতিপরেই ইসলামী বিধান অবতীর্ণ হয়। আর তাতে এ ধরনের প্রতিশোধমূলক শাস্তি প্রদানকেও অবৈধ ঘোষণা করা হয়।

যেমন বুখারীর ভাষ্য হলো,

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهٰى عَنِ الْمُثْلَةِ

অর্থাৎ এই ঘটনার পর মহানবী (সা.) অনুগ্রহ ও উত্তম আচরণ করার নসীহত করতেন আর সর্বাবস্থায় শত্রুদের দেহের মুসলা তথা বিকৃতি সাধন করতে নিষেধ করতেন।

কতক পশ্চিমা গবেষক, যাদের মধ্যে মিওর সাহেবও অন্তর্ভুক্ত, এই ঘটনার চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে স্বভাবসুলভ এই আপত্তি করে যে, যে-পদ্ধতিতে এই হত্যাকারী ডাকাতদের হত্যা করা হয়েছে তা ছিল নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা; কিন্তু যদি সার্বিক পরিস্থিতি দৃষ্টিপটে রেখে লক্ষ্য করা হয় তাহলে এ ঘটনায় ইসলামের আঁচল সম্পূর্ণ পবিত্র দৃষ্টিগোচর হয়। কেননা এই সিদ্ধান্ত মূলত ইসলামের (সিদ্ধান্ত) ছিল না, বরং হযরত মূসা (আ.)–এর (সিদ্ধান্ত) ছিল, যাঁর শরীয়তকে হযরত ঈসা (আ.) বাতিল করেন নি, বরং বহাল রেখেছিলেন। তবে হ্যাঁ, আমাদের প্রতি আপত্তিকারীদের দৃষ্টিতে যদি হযরত মসীহ্ (আ.)– এর এই বাক্য থেকে থাকে যে, 'এক গালে চড় খেয়ে অপর গালও পেতে দাও, কেউ যদি তোমার জামা নিতে চায় তবে তাকে তোমার জুব্বাও দিয়ে দাও, আর যদি কেউ তোমাকে জোর পূর্বক এক ক্রোশ নিয়ে যেতে চায় তবে দুই ক্রোশ চলে যাও'–সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আমাদের আপত্তিকারীদের এই আপত্তি করার অধিকার আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই শিক্ষা কি কোনো বিবেকবান ব্যক্তির দৃষ্টিতে বাস্তবায়নযোগ্য? আর আজ পর্যন্ত এই সাড়ে উনিশশত বছরে, বরং এখন তো দুই হাজার বছরের অধিক হয়ে গেছে, কোনো খ্রিষ্টান নারী বা পুরুষ অথবা কোনো খ্রিষ্টান ফির্কা বা সরকার এই শিক্ষার ওপর আমল করেছে কি? মিম্বরে চড়ে উপদেশ প্রদানের জন্য নিঃসন্দেহে এটি একটি উত্তম শিক্ষা, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে এই শিক্ষার কোনো মূল্য নেই আর না কোনো বিবেকবান ব্যক্তি এই শিক্ষার ওপর আমল করতে প্রস্তুত হবে। সেক্ষেত্রে এরূপ আবেগপূর্ণ খেলনা সামনে রেখে মুসলমানদেরকে আপত্তির লক্ষ্যস্থল বানানো স্বয়ং তাদেরই অজ্ঞতার পরিচায়ক। তবে হ্যাঁ, হযরত মূসা (আ.)–এর শিক্ষাকে সামনে রেখে দেখে যিনি হযরত ঈসা (আ.)–এর বিপরীতে একজন প্রকৃত শরীয়তধারী ছিলেন এবং আইনের বাস্তবতা সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। অথবা খ্রিষ্টানদের মৌখিক কথার পরিবর্তে তাদের ব্যবহারিক জীবনের আলোকে পরিস্থিতি বিচার করো, তাহলেই প্রকৃত বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোনো ধর্মই ইসলামের মোকাবিলা করতে পারে না। কেননা ইসলাম যা

যুগ খলীফার বাণী

যদি তোমরা ইহকাল ও পরকালের সফলতা এবং মানুষের মন জয় করতে চাও, তবে পবিত্রতা অবলম্বন কর, নিজেকে পরিছন্ন রাখ এবং নিজের উত্তম আচরণের নমুনা প্রদর্শন কর। তবেই তোমরা সফলকাম হবে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১লা জানুয়ারী, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

বলে তা-ই করেএবং এর কথা ও কাজ ভিন্ন ভিন্ন নয়; আর ইসলামের কথা ও কাজ উভয়টি এরূপ উন্নতমানে অধিষ্ঠিত যে, কোনো বুদ্ধিমান উদারমনা ব্যক্তি এর ওপর আপত্তি করতে পারে না, বরং মন থেকে এর প্রশংসা বের হয়। মূসায়ী শরীয়তের ন্যায় ইসলাম একথা বলে না যে,'সর্বাবস্থায় প্রতিশোধ গ্রহণ করো এবং প্রতিশোধের অবস্থা বিবেচনা না করেই কুঠার চালাতে থাকো।আর ইসলাম ধর্ম মসীহ্‌র শিক্ষা অনুযায়ী এই নির্দেশনাও দেয় না যে,'কোনো পরিস্থিতিতেই শাস্তি প্রদান কোরো না, বরং অপরাধী যদি কোনো অপরাধ করে তবে তাকে শাস্তি না দিয়ে তার অত্যাচারের বাসনাকে নিজের পক্ষ থেকে সহায়তার মাধ্যমে আরো শক্তিশালী করে দাও'বরং ইসলাম উগ্রতা ও শিথীলতার চরমপন্থার পরিবর্তে সেই মধ্যমপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা প্রদান করে যা পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি। আর তা হলো এই যে,

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ

অর্থাৎ প্রত্যেক মন্দের প্রতিফল তার অনুরূপ ও তার তীব্রতা অনুযায়ী হওয়া উচিত। কিন্তু অবস্থা যদি এমন হয়ে থাকে যে, ক্ষমা করলে বা নমনীয়তা প্রদর্শন করলে সংশোধনের সম্ভাবনা আছে, সেক্ষেত্রে ক্ষমা করা বা নমনীয়তা প্রদর্শন করাই উত্তম। আর এরূপ ব্যক্তি খোদা তা'লার নিকট উত্তম প্রতিদান লাভের যোগ্য হবে। (সূরা শূরা: ৪১)

এটি সেই শিক্ষা যা ইসলাম এ বিষয়ে প্রদান করেছে এবং কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, এটি একটি মহান শিক্ষা যেখানে মানবীয় প্রয়োজনীয়তার সকল দিককে দৃষ্টিপটে রাখা হয়েছে। আর শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রেও ইসলাম এই সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, তা যেন যথোচিত হয়, সীমালঙ্ঘন যেন না করা হয় এবং মুসলা (তথা মৃতের অঙ্গচ্ছেদ) প্রভৃতির ন্যায় বর্বরতাকে এক বাক্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর বিপরীতে খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর এই বাহ্যিক শিক্ষা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শত্রুদের সাথে আচরণের যেই ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আসছে এবং যুদ্ধসমূহে যেসব কর্মকাণ্ড করেছে এবং করছে, সেটি বিশ্ব ইতিহাসের এক উন্মুক্ত অধ্যায় যার পুনরাবৃত্তির এখানে প্রয়োজন নেই।" (সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৭৪৪-৭৪৭) তারা কী না করে!

এখন আরেকটি যুদ্ধের উল্লেখ করবো যেটিকে যি কারদ-এর যুদ্ধ বলা হয়। এর সম্পর্কে ইতিহাসবিদ ও হাদীস বিশারদদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে যে, এটি কবে সংঘটিত হয়েছে। হাদীস বিশারদরা এটিকে হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে এবং খায়বারের যুদ্ধের পূর্বে ষষ্ঠ হিজরীর জিলক্বদ মাস এবং সপ্তম হিজরীর মহররম মাসের মধ্যবর্তী যুদ্ধ আখ্যা দিয়ে থাকেন। অপরদিকে ইতিহাসবিদরা এটিকে লিহয়ানের যুদ্ধের পওে, অর্থাৎ ষষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল উলা মাসের যুদ্ধ আখ্যা দেয়। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের মতে যি কারদ-এর যুদ্ধ খায়বারের যুদ্ধের তিন দিন পূর্বে সংঘটিত হয় এবং তারা এর উল্লেখ হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে এবং খায়বারের যুদ্ধের পূর্বে করেছেন। আল্লামা ইবনে হাজার লিখেছেন যে, ইমাম আহমদ ও ইমাম মুসলিম আইয়্যাস বিন সালামার যেই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন সেটি এই কথাকে সমর্থন করে যে, এই যুদ্ধ খায়বারের যুদ্ধের তিন দিন পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। এই রেওয়ায়েতে হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.) প্রথমে হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং এরপর যি কারদ-এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে বলেছেন,এরপর আমরা মদীনাতে ফেরত আসি এবং তিনদিন মাত্র মদীনাতে অবস্থান করেই খায়বারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাই। এর বিপরীতে ইতিহাসবিদদের মধ্য থেকে আল্লামা ইবনে ইসহাক এবং ইবনে সা'দ বলেন, যি কারদ-এর যুদ্ধ ছয় হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

(সুবুলুল হুদু ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৬) (আসসীরাতুনববীয়াহ লি ইবনে কাসীর, পৃ: ৩৬৫-৩৭৫) (শারাহ যুরকানী আলা মোয়াহিবুল লাদানিয়া, ৩য় খণ্ড,পৃ: ১০৯)

এই বিষয়টির বিশ্লেষণ হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে করেছেন, পূর্ণাঙ্গীনরূপে যদিও করেন নি, কিন্তু নিজের পুস্তকের অবশিষ্টাংশের জন্য যেই বিষয়সূচি তিনি লিখেছেন, তাতে তিনি যি কারদ-এর যুদ্ধকে খায়বারের যুদ্ধের পূর্বে সপ্তম হিজরীর মহররম মাসের যুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। (সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৮৩৭)

যি কারদ-এর যুদ্ধকে গাবা-র যুদ্ধও বলা হয়ে থাকে। কেননা মহানবী (সা.)-এর উটনীগুলো এখানে চরানো হতো।

গাবা মদীনা থেকে সিরিয়ার দিকে চার মাইল দূরত্বে উহুদ পাহাড়ের পিছনে একটি ময়দান ছিল। আর এটিকে যি কারদ-এর যুদ্ধ এজন্য বলা হয় যে, উআয়না বিন হিসন, যে মহানবী (সা.) এর উটনীগুলো হামলা করে নিয়ে গিয়েছিলো, মহানবী (সা.) যি কারদ পর্যন্ত তার পিছু ধাওয়া করেছিলেন। যি কারদ মদীনা থেকে প্রায় বারো মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি ঝরনা।

(ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ২১৭)

এর বিস্তারিত বিবরণ হলো- রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বিশটি দুগ্ধবতী উটনী ছিল। আরো কিছু উটও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেগুলো মদীনা থেকে খায়বারের পথে বায়যা চারণভূমি এবং এর অপর দিকের পাহাড় পর্যন্ত চরে বেড়াতো। সেখানে অনাবৃষ্টি দেখাদেয়, তখন সেগুলোকে গাবার দিকে নিয়ে আসা হয়। একজন রাখাল প্রতিদিন মাগরিবের সময় সেগুলোর দুধ দোহন করে মহানবী (সা.) এর কাছে নিয়ে আসতো।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৫) (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৬৩)

উআয়না বিন হিসন ফাযারী বনু গাতফানের চল্লিশজন অশ্বারোহীর সাথে সেগুলোর ওপর আক্রমণ করে এবং উটগুলো নিয়ে যায়। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে তাদের নেতা উআয়নার পুত্র আব্দুর রহমান ছিল এবং উআয়না তাদের সাহায্যের জন্য পেছনে একটি স্থানে অপেক্ষমান ছিলো।আক্রমণের সময় শত্রুরা হযরত আবু যার (রা.) এর পুত্র যারকে হত্যা করে, যে এই উটগুলোর রাখাল ছিল। আর হযরত আবু যারের (রা.) স্ত্রী লায়লাকে বন্দি করে নিয়ে যায়। অথচ হযরত আবু যার (রা.)-এর পুত্রবধু, যে সেখানেই উপস্থিত ছিল, শত্রুদের হাত থেকে বেঁচে যায়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৫)

উআয়না বিন হিসন কে ছিলো- তার পরিচয়ে লেখা আছে যে, উআয়না আহযাবের যুদ্ধের সময় বনু ফুযারা গোত্রের নেতা ছিলো। আহযাবের যুদ্ধের সময় যখন শত্রুদের তিনটি সেনাবাহিনী বনু কুরায়যার সাথে যোগ দিয়ে মদীনার ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করার সংকল্প করেছিলো তখন তাদের একটি সেনাদলের নেতা ছিলো উআয়না। উআয়না বিন হিসন মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করে। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, উআয়না মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং এতে অংশ নিয়েছিলো। আর হুনায়েনের যুদ্ধ এবং তায়েফের যুদ্ধেও যোগদান করেছিলো। মহানবী (সা.) তাকে বনু তামীম গোত্রকে দমন করার জন্য পঞ্চাশ জন আরোহী সহ প্রেরণ করেছিলেন। তাদের মাঝে কোনো আনসার কিংবা মুহাজের সাহাবী ছিল না। আর এই অভিযানের কারণ যা ছিল তা হলো বনু তামিম গোত্র মহানবী (সা.) এর কর্মচারীকে সদকা নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল। এরপর আবু বকরের যুগে বিদ্রোহী মুরতাদদের সাথে সে-ও ধর্মত্যাগের নৈরাজ্যের শিকার হয়েপড়ে এবং তুলায়হা যখন নবুয়তের দাবি করে তখন তার সাথে যোগ দেয়। অর্থাৎ সে প্রথমে মুসলমান হয়, এরপর সে মুরতাদ হয়ে যায় এবং তার (অর্থাৎ তুলায়হার) হাতে বয়আত করে। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা.) কাছে বন্দি হয়ে আসলে তিনি (রা.) তার প্রতি অনুগ্রহ করে তাকে ক্ষমা করে দেন। এরপর সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৬) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ৬৩৯) (যিয়াউন্নবী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৬৬-৫৬৭)

অর্থাৎ তার ঈমানের অবস্থা এরূপ দোদুল্যমান ছিল।

রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত আবু যার গিফারীকে (রা.) গাবা যেতে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) এর সাবধান করা সত্ত্বেও হযরত আবু যার গিফারী (রা.) গাবা যান। এর বিস্তারিত বর্ণনায় লেখা আছে যে,উআয়নার আক্রমণের পূর্বে হযরত আবু যার মহানবী (সা.) এর কাছে উটনীগুলোর চারণভূমির দিকে যাওয়ার অনুমতি চান। তিনি (সা.) বলেন, আমি তোমার বিষয়ে এই ভেবে শঙ্কিত যে- শত্রু তোমার ওপর এদিক থেকে আক্রমণ না করে বসে, কেননা আমরা উআয়না ও তার সঙ্গীদের দিক থেকে নিরাপদ নই। আর এই জায়গাও তাদের নিকটবর্তী। হযরত আবু যার (রা.) জেদ করেন। মহানবী (সা.) বলেন, আমার ভয় হচ্ছে- তোমার ছেলেকে হত্যা এবং তোমার স্ত্রীকে বন্দি করা হবে আর তুমি একটি লাঠিতে ভর করে ফিরে আসবে। হযরত আবু যার (রা.) বলেন, আমি নিজের কাজে বিস্মিত, মহানবী (সা.) বার বার বলছিলেন যে, আমি তোমার বিষয়ে শঙ্কিত আর আমি এরপরও জেদ করেছি। অতঃপর আল্লাহর কসম! তেমনই ঘটে যেমনটি মহানবী (সা.) বলেছিলেন। আমি ঘরে ছিলাম আর মহানবী (সা.) এর উটনীগুলো খামারে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। তাদের পরিতৃপ্ত করা হয়েছিল, অর্থাৎ তাদের খাবার ও পানি দেওয়া হয়েছিল। সেগুলোর দুধ দোহন করা হয়েছিল। এরপর আমরা ঘুমিয়ে পড়লে রাতের বেলা উআয়না চল্লিশজন অশ্বারোহী নিয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ করে। তারা থেমে যুদ্ধের হাঁক দেয়। তখন আমার ছেলে বাইরে বের হয়, যাকে তারা হত্যা করে ফেলে। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৫)

যুগ ইমামের বাণী

সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে। **(সহী মুসলিম, কিতাবুল মাসাকাত)**

দোয়াপ্রার্থী: Jahan ara Begum, Bhagwangola, Murshdabad

এই প্রেক্ষিতে হযরত সালামা বিন আকওয়ার (রা.) শত্রুদের পিছু ধাওয়া করারও উল্লেখ পাওয়া যায়। বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, আমি ফজরের প্রথম আযান দেওয়ার পূর্বেই বের হই। মহানবী (সা.)-এর দুগ্ধবতী উটনীগুলো যি-করদ নামক স্থানে চরানো হতো। হযরত সালামার সাথে মহানবী (সা.) এর ক্রীতদাস রাবাহ্ও ছিল। হযরত সালামা বলেন, আব্দুর রহমান বিন অওফ এর এক ছেলের সাথে আমার দেখা হয় আর সে আমাকে বলে, মহানবী (সা.) এর উটনীগুলো ছিনতাই হয়েছে। আমি বললাম, সেগুলো কে ছিনতাই করেছে? সে বলল, গাতফান গোত্রের লোকেরা। তিনি অর্থাৎ হযরত সালামা বলেন, আমি উচ্চৈস্বরে তিন বার হে সাবাহা বলে ডাকি। এই শব্দ বিপদের সময় বলা হতো। তাই আমি মদীনায় যারা ছিল তাদেরকে উচ্চৈস্বরে জানিয়ে দিই যেন তারা সেখানে চলে আসে। তার গলার স্বর যথেষ্ট উঁচু ছিল আর মহানবী (সা.)-কে খবর দেবার জন্য রাবাহ্কে প্রেরণ করি। এরপর বলেন, আমি সামনের দিকে ছুটতে শুরু করি এবং সেই আক্রমণকারী ডাকাতদের কাছে পৌঁছে যাই। তখন তারা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছিল। আমি আমার তির দ্বারা তাদের ওপর আক্রমণ করতে থাকি আর আমি অভিজ্ঞ তিরন্দাজ ছিলাম। আমি বলছিলাম, আমি ইবনে আকওয়া আর আজ কেবল কাপুরুষদের ধ্বংসের দিন। অর্থাৎ তিনি একাই মোকাবিলার জন্য বেরিয়ে পড়েন। আর আমি উচ্চৈস্বরে এটি পাঠ করছিলাম। আমি যখন গাছপালার মাঝে থাকতাম তখন তাদের উপর তির নিক্ষেপ করতাম। আর যখন সংকীর্ণ গিরিপথ আসতো তখন পাহাড়ে চড়ে তাদের ওপর পাথর ফেলতাম। এমনকি তাদের কাছ থেকে সকল উট মুক্ত করে নিই।

সহীহ মুসলিমে এই শব্দাবলি রয়েছে। আমি এভাবেই তাদের পিছু ধাওয়া করতে থাকি, এমনকি মহানবী (সা.) এর উটগুলোর মধ্য থেকে এমন কোনো উট বাকি ছিল না যা আমি আল্লাহর কৃপায় মুক্ত করিনি।আর তাদের কাছ থেকে ত্রিশটি চাদরও ছিনিয়ে নিই যা তারা বোঝা কমানোর জন্য ছুটতে ছুটতে ফেলে দিয়েছিল। যে জিনিসই তারা ফেলে দিত আমি সেগুলোর ওপর চিহ্নস্বরূপ পাথর রেখে দিতাম, যেন মহানবী (সা.)এবং তাঁর সাহাবীরা চিনতে পারেন। আর আমি তাদের পিছুধাওয়া করতে থাকি এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করতে থাকি। অর্থাৎ তিনি একাই মোকাবিলা করতে থাকেন। (বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪১১৪)(সহীহ মুসলিম,কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৩৩৫৮)

ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থে এ হাদীসের দ্বিতীয় প্রারম্ভ সম্পর্কে এটিও লেখা আছে যে, সকল উষ্ট্রী ফেরত আনা সম্ভব হয় নি। কিছু উষ্ট্রী শত্রুরা নিজেদের সাথে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৭)

যাইহোক, অপরদিকে মহানবী (সা.)-এর নিকট যখন এ ঘটনার সংবাদ পৌঁছে তখন মদীনায় ঘোষণা করা হয় যে, বিপদের সময় এসেছে। অতএব ঘোষণা দেওয়া হয়, ইয়া খাইলুল্লাহিল কাবীর। অর্থাৎ, হে আল্লাহ্র অশ্বারোহী দল! আরোহণ করো। তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহীরা তাঁর (সা.) নিকট একত্রিত হতে থাকেন। সর্বপ্রথম হযরত মিকদাদ (রা.) তাঁর (সা.) সমীপে উপস্থিত হন। অতঃপর হযরত আব্বাদ বিন বিশর, সা'দ বিন যায়েদ, উসায়েদ বিন হুযায়ের, উকাশা মু'রিয বিন নাযলা, আবু কাতাদা এবং আবু আইয়াশ-ও পৌঁছে যান। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন যায়েদ (রা.)-কে আমীর নিযুক্ত করেন এবং বলেন, শত্রুর মোকাবিলার জন্য বের হও। আর আমিও দলবল-সহ তোমাদের সাথে এসে মিলিত হবো। অর্থাৎ তিনি (সা.) বলেন, তোমরা সামনে যেতে থাকো আর আমি পিছন পিছন আসছি। মহানবী (সা.) পাঁচশ সাহাবীকে সাথে নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেন। আর এটিও বলা হয়ে থাকে যে, সাতশ (সাহাবী) নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেন। তিনি (সা.) মদীনায় হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন আর হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-কে তিনশ সাহাবী সমেত মদীনার সুরক্ষার জন্য পিছনে রাখেন। মহানবী (সা.) হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা.)-এর বর্শার মাথায় পতাকা বেঁধে দেন। (শারাহ আল আল্লমা যুরকানি, ৩য় খণ্ড,পৃ: ১১৩)

এই অভিযানে একটি ঘটনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, ইবনে ইসহাক বলেন, মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু আইয়াশ! তুমি কি তোমার ঘোড়া এমন কাউকে দিতে পারছো না, যে কি-না তোমার চেয়ে উত্তম আরোহী? যেন সে শত্রুর সাথে মিলিত হতে পারে। হযরত আবু আইয়াশ বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমিই সবচেয়ে উত্তম অশ্বারোহী। তিনি বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-কে এই কথা বলে বসি এবং এরপর আমি ঘোড়া হাঁকাই, কিন্তু পঞ্চাশ গজ যেতে না যেতেই সেটি আমাকে মাটিতে ফেলে দেয়। আমি অবাক হই যে, মহানবী (সা.) আমাকে নিজের চেয়ে ভালো আরোহীকে ঘোড়াটি দিয়ে দিতে বলছিলেন আর আমি বলছিলাম, আমিই সবচেয়ে ভালো আরোহী। অতঃপর মহানবী (সা.) হযরত আবু আইয়াশ-এর ঘোড়া হযরত মুআয বিন মায়েস-কে দিয়ে দেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৭-৯৮)

হযরত সালামা, যিনি শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন, বলেন, দিনের আলো ফুটলে উআয়না তাদের সাহায্যের জন্য আসে। এ থেকে বুঝা যায় যে, উআয়না নিজে সেখানে উপস্থিত ছিল। সে একটি সংকীর্ণ ঘাঁটিতে অবস্থান করছিল। তিনি বলেন, আমি পাহাড়ের ওপর আরোহণ করি। উআয়না বলে, এ ব্যক্তি কে? উআয়নার সঙ্গীরা তাকে বলে, সকাল থেকে এখন পর্যন্ত আমরা এই বিপদেই আছি যে, সে আমাদের পিছু ধাওয়া করছে, আমাদের ওপর তির বর্ষণ করছে এবং তাদের পশুগুলোকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে। সে আমাদের সব জিনিস ছিনিয়ে নিয়েছে। উআয়না বলে, তার যদি এ বিশ্বাস না থাকত যে,তার পিছন পিছন লোকেরা আসছে, তবে সে তোমাদের অনেক আগেই ছেড়ে পালাতো। সে বেশ চতুর ছিল। সে বলল, নিশ্চিতরূপে তার পিছনে অন্য কোনো দল আসছে। তোমাদের মধ্য থেকে কিছু মানুষ তার দিকে যাও। অর্থাৎ সে তার সঙ্গীদের একথা বলে। অতএব তাদের মধ্য থেকে চার ব্যক্তি আমার দিকে আসে এবং পাহাড়ে আরোহণ করে। আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা কি আমাকে চেনো? তারা বলল, তুমি কে? আমি বললাম, আমি ইবনে আকওয়া। সেই সত্তার কসম, যিনি মহানবী (সা.)-কে মর্যাদা দান করেছেন! তোমাদের মাঝে কেউ আমাকে ধরতে পারবে না আর আমি যদি তার পশ্চাদ্ধাবন করি, তবে সে আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমার ধারণাও তা-ই। অতঃপর তারা ভয়ে ফেরত চলে যায়। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত।

(বুখারী কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪১১৪)(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৬)

হযরত সালামা বর্ণনা করেন যে, আমি সেখানেই ছিলাম। এমতাবস্থায় আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সেই অশ্বারোহীদের দেখতে পেলাম যাদেরকে মহানবী (সা.) তাঁর পূর্বে প্রেরণ করেছিলেন।তারা গাছের আড়াল থেকে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, তাদের মাঝে সর্বপ্রথমে ছিলেন মু'রেয বিন নাযলা আখরাম আসাদী আর তার পেছনে ছিলেন আবু কাতাদা আনসারী আর তার পর মিকদাদ বিন আসওয়াদ ছিলেন, যিনি পরবর্তীতে আসেন। আমি আখরামের ঘোড়ার লাগাম ধরে বললাম, হে আখরাম! তুমি তাদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করো, যেন তারা তোমাকে হত্যা করতে না পারে। অর্থাৎ সামনে অগ্রসর হয়ো না, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করো যতক্ষণ না রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা এসে পৌঁছেন। তিনি বলেন, হে সালামা! তুমি যদি আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখো আর তুমি জানো যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, তাহলে তুমি আমার এবং শাহাদাতের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ো না। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তিনি একথা বলেন। তিনি (অর্থাৎ সালামা) বলেন, আমি তাকে ছেড়ে দিই। অতঃপর হযরত আখরাম এবং আব্দুর রহমান বিন উআয়না পরস্পর মুখোমুখি হয় আর তিনি আব্দুর রহমানসহ তার ঘোড়াকে আহত করেন। আর আব্দুর রহমান তাকে বর্শা মেরে শহীদ করে দেয় এবং তার ঘোড়ার ওপর আরোহণ করে পিছনে চলে যায়।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আখরামকে অওবার শহীদ করেছিল।অওবার ও তার পুত্র একই উটে আরোহিত ছিল। হযরত উকাশা একটি বর্শা নিক্ষেপ করেন আর তাদের উভয়কে এক আঘাতেই হত্যা করেন। আরেক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আখরামকে মাসআদা শহীদ করেছিল।

শাহাদতের ঘটনা সম্পর্কে একটি স্বপ্নেরও উল্লেখ রয়েছে। হযরত আখরাম শত্রুদের সাথে লড়াইয়ের এক দিন পূর্বে স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, আমার জন্য আকাশ উন্মুক্ত করা হয়েছে আর আমি আকাশে প্রবেশ করেছি, এমনকি আমি সপ্তম আকাশে আর এরপর সিদরাতুল মুনতাহাতে পৌঁছে গিয়েছি। আমাকে বলা হলো, এটিই তোমার ঠিকানা। আমি এ স্বপ্ন হযরত আবু বকরের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বলেন, তোমার জন্য শাহাদত মোবারক হোক। আর এর একদিন পরই তাকে শহীদ করা হয়। হযরত মু'রেয-এর পিছনে হযরত আবু কাতাদাও পৌঁছে গিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর অশ্বারোহী আবু কাতাদা-র লড়াই আব্দুর রহমান বিন উআয়নার সাথে হয়। তারা একে অপরের প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করতে থাকে। উআয়নার পুত্র আবু কাতাদা-র ঘোড়ার পায়ের শিরা কেটে দেয় আর হযরত আবু কাতাদা তার ভবলীলা সাঙ্গ করেন এবং স্বয়ং তার ঘোড়ায় উঠে বসেন।

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

(সহীহ মুসলিম, ৯ম খণ্ড,পৃ:২৩৩-২৩৫) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৮-৯৯)

হযরত আবু কাতাদা-র মাসআদা ফাজারীর সাথে লড়াইয়ের ব্যাপারেও উল্লেখ রয়েছে। এক বর্ণনানুযায়ী হযরত আবু কাতাদা যখন এই ঘটনা অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণের সংবাদ জানতে পারেন তখন মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের সাথে মদিনা থেকে সফর করে যুবাবে অবস্থানরত ছিলেন,যা সানিয়্যাতুল বাদা থেকে নীচের দিকে উহুদ পাহাড়ের পথে একটি ছোট কালো পাহাড়। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আসলে তিনি (সা.) বলেন, হে আবু কাতাদা! সামনে অগ্রসর হও। আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করুন। হযরত আবু কাতাদা বলেন, আমি রওয়ানা হই আর আমার সাথে আরেক ব্যক্তি ছিলেন। আমরা উভয়ে দ্রুত শত্রুদের কাছে পৌঁছে যাই। তার সঙ্গী তাকে বলেন, হে আবু কাতাদা! তোমার কি মনে হয়? তাদের মোকাবিলার সামর্থ্য আমাদের নেই। তিনি বলেন, তুমি কি বলছো যে, আমি মহানবী (সা.)-এর আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করব? অর্থাৎ আমরা দুইজন আক্রমণ করার পরিবর্তে পুরো সেনাবাহিনী পেছন থেকে এসে পৌঁছালে তবেই আমরা আক্রমণ করব? আবু কাতাদা বলেন, আমি বললাম, আমি তো চাই যে, তুমি একদিক থেকে আক্রমণ করবে আর আমি আরেক দিক থেকে। এরপর তারা উভয়ে আক্রমণ করেন এবং শত্রুদের বিপদে ফেলে দেন। শত্রুরা তাকে উদ্দেশ্য করে তির নিক্ষেপ করলে একটি তির তার কপালে এসে লাগে। হযরত আবু কাতাদা বলেন, আমি যখন সেই তির বের করি তখন আমার মনে হলো যেন আমি লোহার টুকরা বের করে নিয়েছি। আমি সামনে অগ্রসর হই। তখন এক দ্রুতগামী অশ্বারোহী আমার সামনে আসে, যে শিরস্ত্রাণ পরিহিত ছিল। সে আমাকে চিনতে পেরেছিল, কিন্তু আমি তাকে চিনতে পারি নি। সে বলে, হে আবু কাতাদা! আল্লাহ্ তোমার ও আমার সাক্ষাৎ করিয়েছেন। সে তার চেহারা থেকে শিরস্ত্রাণ নামালে দেখা যায় সে ছিল মাসআদা ফাজারী। সে বলল, তুমি কোনটি পছন্দ করো, তরবারি নাকি বর্শা চালনা। অর্থাৎ তুমি কীভাবে লড়তে চাও, তরবারি দিয়ে, নাকি বর্শা দিয়ে, নাকি কুস্তি করবে। আমি বললাম, এটি তোমার পছন্দ, তুমি যা চাও করতে পারো। সে বলল, তাহলে আমরা কুস্তি করি। সে যুগে যুদ্ধেরও অদ্ভুত রীতি ছিল! সে নিজের বাহন থেকে নীচে নেমে আসে, আমিও নীচে নেমে আসি। আমি আমার ঘোড়া একটি গাছের সাথে বাঁধি এবং নিজের অস্ত্র সেখানেই রাখি, আর সে-ও তা-ই করে। অতঃপর আমরা লড়াই আরম্ভ করি,আর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তার ওপর বিজয় দান করেন। আমি তার ওপর চড়াও হই। আমি সংকল্প করি যে, আমি উঠে নিজ তলোয়ার নিয়ে নিব আর সে-ও তার তলোয়ার নিয়ে নিবে। আমরা দুটি দলের মাঝখানে ছিলাম, এজন্য আমাদের উভয়ের ওপরই আক্রমণ হতে পারতো। আমার মাথায় কোনো একটি জিনিস এসে পড়ে। আমরা লড়াই করতে করতে মাসআদার অস্ত্রের কাছে পৌঁছে যাই। আমি হাত বাড়িয়ে তার তরবারি উঠিয়ে নিই। যখন সে দেখল, তার তরবারি আমার হাতে এসে গেছে তখন সে বলল, হে আবু কাতাদা! কিছুটা হলেও আমার সম্মান রেখো। আমি বললাম, না। এখন তুমি তোমার ঠিকানা জাহান্নাম দেখে নাও। অতঃপর তাকে হত্যা করি আর তাকে নিজ চাদরে জড়িয়ে দিই। এরপর তার কাপড় আমি নিজে পরে নিই এবং তার অস্ত্র নিয়ে নিই আর তার ঘোড়ায় আরোহণ করি, কেননা আমরা যখন লড়াই করছিলাম তখন আমার ঘোড়া শত্রুদের দিকে পালিয়ে গিয়েছিল আর তারা সেটির পায়ের রগ কেটে দিয়েছিল। আমি দ্রুততার সাথে সামনে অগ্রসর হই আর মাসআদার ভাতিজাকে ধরে ফেলি। তার সাথে আরো সতেরো জন আরোহী ছিল। আমি তাদেরকে ইশারা করলে তারা থেমে যায়। এরপর আমি যখন তাদের কাছে পৌঁছি তখন আমি তাদের ওপর আক্রমণ করি। আর মাসআদার ভাতিজার প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করি এবং তার ঘাড় ভেঙে দিই। তার সঙ্গীরা পলায়ন করে। অতঃপর আমি উটগুলোকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিই যা হযরত সালামা বিন আকওয়ারআক্রমণের সময় বিরোধীরা রেখে পলায়ন করেছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৯-১০০) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১২৫) (বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪১১৪)

এই যুদ্ধের ঘটনার বর্ণনা এখনো বাকি আছে, যা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণিত হবে।

❁****❁****❁****❁

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত এবং জামাতের সঙ্গে যারা সম্পর্ক স্থাপন করে, আল্লাহ তা'লা তাদের পথ-প্রদর্শন করেন।

-খুতবা জমা ২৪ মে ২০১৯

দোয়াপ্রার্থী: **Noor Jahan Begum, Kolkata**

১৩ পাতার পর.....

খিলাফতের আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনায় প্রচারের উদ্যোগকে যার অগ্নি মহানবী (সা.) প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, অতঃপর সামান্তরালভাবে মহানবী (সা.) এর প্রকৃত দাসের যুগেও সেই প্রজ্জ্বলিত শিখাকে সর্বদা প্রত্যক্ষ করছি।

আমরা এক একথা মেনে নিব যে, যে বার্তা প্রেরণের জন্য মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর প্রকৃত সেবক হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.)স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সেই বার্তা প্রচার ও প্রসার করা ব্যতীত আমরা কি আরামে বসে থাকব? আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে সত্য প্রচারে পূর্ণ অবদান রাখার তৌফিক দান করুন। আমীন।

মহোদয়গণ! প্রিয় হুযুর হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন, মো'মিন সেই ব্যক্তি যিনি সর্বদা উন্নত থেকে উন্নততর পথ পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করে এবং সর্বদা আল্লাহ্ র সন্তুষ্টি কামনা করে। অন্যথায় এই পৃথিবী তো আমাদেরকে কাফের বলে অভিহিত করে। আমরা যদি আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মো'মিন না হই,তবে পরিতাপ। এই বিষয়ে একটি ঘটনা রয়েছে।

হযরত ডাঃ হাশমাতুল্লাহ্ খান সাহেব বর্ণনা করেন,

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, আহমদীয়া জামাতের জন্য অনেক উদ্বেগের বিষয় , কারণ একদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের কাফের বলে, অন্যদিকে যদি তারা ঈমানদার না হয়, তাহলে এটি তাদের জন্য দ্বিগুণ ঘাটা। হাশমাতুল্লাহ্ সাহেব বলেন, যতদূর মনে পড়ে এটাই ছিল হুযুর (আ.)-এর শেষ নির্দেশ বা ওসীয়্যত যা আমি নিজের কানে শুনেছি।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, তাদের (অর্থাৎ, বিরোধীদের) হৃদয় বিদারক কটূক্তি ও অপমান, যা তারা মহানবী (সা.) সম্পর্কে করেছে, খোদার কসম, যদি আমার সকল সন্তান-সন্ততি এবং আমার সকল বন্ধু-বান্ধব এবং আমার সকল সাহায্যকারী ও সহায়কে আমার চোখের সামনে হত্যা করা হয় এবং আমার নিজের হাত-পা কেটে ফেলা হয় এবং আমার চোখের মণি বের করে দেওয়া হয় এবং আমি যদি আমার সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলি। আমি আমার ইচ্ছা থেকে বঞ্চিত এবং আমার সমস্ত সুখ এবং আমার সমস্ত আরাম থেকে বঞ্চিত করা হয়, তারপরও এই সমস্ত কিছুর বিপরীতে এই ধাক্কা আমার জন্য আরও ভারী যে, মহানবী (সা.)-এর উপর এমন অপবিত্র আক্রমণ করা হয়।"

(আরবী অনুচ্ছেদের অনুবাদ,রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ: আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃ: ১৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আজীবন যে সত্যিকারের ভালবাসা ও বেদনার সাথে ইসলামের সেবা চালিয়ে গেছেন, তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তিনি তাঁর খোদা প্রদত্ত প্রতিভাকে ইসলামের সার্বিক সেবার জন্য উৎসর্গ করেছেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এবং শক্তির প্রতিটি কণা এ পথেই উৎসর্গ করেছেন। কলমের জেহাদে তিনি এত পরিশ্রম করতেন যে মাঝে মাঝে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়তেন। যে অসুস্থতায় তিনি ইহকাল ত্যাগ করেছিলেন, সেই সময়েই তিনি তাঁর শেষ গ্রন্থ শান্তির বার্তা রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। পরিশেষে কলমের জিহাদরত অবস্থায় নশ্বর পৃথিবী পরিত্যাগ করেছিলেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতামন্ডলী! ইসলাম ধর্মের এত খেদমত করার পরও তার মুখ হতে যে কথাগুলো বরে হয়ে আসছিল, তা হল 'আমরা যা করা উচিত ছিল তা আমি করতে পারি নি এবং আমি নিজেকে একজন অযোগ্য কর্মী মনে করি।" পরিশেষে এটাই বলব, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কলমের অধিকার সঠিক অর্থে পুরণ করেছেন, এখন আসুন আমরা এই জীবনদায়ী বাণীগুলো বারবার পড়ি এবং সেগুলো দিয়ে আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করি। এই আধ্যাত্মিক ভান্ডারটি (রূহানী খাযায়েন) সমগ্র মানবজাতির সম্মিলিত সম্পদ। আসুন আমরা এই সম্পদকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিই, দেশ বিদেশ, শহর ও গ্রামে একে প্রসারিত করি।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি নির্দেশনা উল্লেখ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, এখন সময় খুব কঠিন। আমি বারবার উপদেশ দিচ্ছি যে, কোন যুবক যেন বিশ্বাস না করে যে তা বয়স আঠারো বা উনিশ বছর এবং এখনও অনেক সময় বাকি আছে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তি যেন তার স্বাস্থ্য ও ফিটনেস নিয়ে গর্ব না করে। একইভাবে, যে ব্যক্তি ভাল অবস্থানে রয়েছে সে যেন তার প্রভাব প্রতিপত্তির উপর ভরসা না করে। এটা বিপ্লবের সময়। এটা আখেরী যামানা। আল্লাহ্ সত্যবাদী ও মিথ্যুকদের পরীক্ষা করতে চান। এটা সততা ও আন্তরিকতা দেখানোর সময় এবং শেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই সময় আর ফিরে আসবে না। এটি এমন সময় যে সকল নবীর সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি এখানে এসে মিলিত হয়েছে। তাই মানবজাতিকে দেওয়া আন্তরিকতা ও সেবার এটাই শেষ সুযোগ। এরপর আর কোন সুযোগ থাকবে না। খুবই দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যে এই সুযোগ হাতছাড়া করছে। মৌখিক বয়আতের অঙ্গীকার করা কোন কৃতিত্ব নয়, বরং চেষ্টা কর, আল্লাহ্র কাছে দোয়া কর তিনি যেন তোমাকে ধার্মিক বানান। এক্ষেত্রে অলসতা প্রদর্শন না করা,বরং অধ্যবসায়ী হও এবং আমি যে শিক্ষা পেশ করছি তার উপর আমল করার চেষ্টা কর এবং আমি যে পথ দেখিয়েছি তা অনুসরণ কর। (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ: ২৬৩-২৬৪)

****

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রসুল প্রেম

-হাফিজ মখদুম শরীফ, নাজির নশর ও ইশাআত, কাদিয়ান

-অনুবাদক: জাহিরুল হাসান, ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ-
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তুমি বল,'যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর; আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তিনি তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।"

জলসার সম্মানিত সভাপতি ও সুধী দর্শকমণ্ডলী! যেমনটা আপনারা শুনেছেন আমার বক্তৃতার শিরোনাম হল-

রসুল প্রেমের দর্পণে হযরত মসীহ মওউদ(আ.-)-এর জীবনী।

শ্রোতামন্ডলী! সৈয়্যদনা হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- "আমি সেই দর্পণ, যাতে মুহাম্মদী ব্যক্তিত্ব এবং মুহাম্মদী নবুওয়াত সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়।"

(নুযুলুল মসীহ, রূহানী খাযায়েন, ১৮তম খণ্ড,পৃ:৩৮১ টীকা)

প্রকৃতপক্ষে,এই যুগে আমরা যদি সৈয়্যদানা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর অলৌকিক ঘটনা, অত্যাশ্চর্য নিদর্শনাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা এবং শ্বাশ্বত নিদর্শনগুলো অবলোকন করতে চাই, তবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দর্পণেই আমরা তা অবলোকন করতে পারি, কারণ এখন ফায়যানে (কল্যাণরাজি) খাতামান্নবীঈন এর অনুগ্রহ লাভ করতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর দর্পন ব্যতীত কোন দর্পন নেই। মহান আল্লাহ্ বিশ্বে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) -এর মহিমা, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা প্রতিষ্ঠাতার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে প্রেরণ করেছেন এবং এই উদ্দেশ্যটি পূরণ করার জন্য মহান আল্লাহ্ তাঁর মাঝে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্যের আবেগ এমনভাবে সঞ্চার করেন যে, রসুল প্রেম তাঁর আত্মার খোরাক এবং জীবন সঞ্জীবনী সুধায় পরিণত হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন-

وَذِكْرُ الْمُصْطَفٰى رُوحٌ لِقَلْبِي / وَصَارَ لِمُهْجَتِي مِثْلَ الطَّعَامِ
يَا حِبِّ إِنَّكَ قَدْ دَخَلْتَ مَحَبَّةً / فِي مُهْجَتِي وَمَدَارِكِي وَجَنَانِي
مِنْ ذِكْرِ وَجْهِكَ يَا حَدِيقَةَ بَهْجَتِي / لَمْ أَخْلُ فِي لَحْظٍ وَّلَا فِي آنِ

অর্থাৎ মুহাম্মদ মোস্তফা(সা.)-এর স্মৃতি আমার হৃদয়ের প্রাণ এবং তাঁকে স্মরণ করা আমার খোরাক যা ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না। হে আমার প্রিয়তম! আমার প্রেমাস্পদ! প্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে, তুমি আমার শরীর এবং আত্মায় সঞ্চারিত হয়েছ। আমার আত্মায়,আমার মননে এবং আমার হৃদয়ে শুধু তুমিই বাস কর।

হে আমার সুখ ও সমৃদ্ধির বাগিচা! আমি এক মুহূর্তকালও তোমার স্মৃতি থেকে কখনও বিস্মৃত হই নি।

সুধী দর্শকমণ্ডলী! হযরত সৈয়্যদা নবাব মুবারকা বেগম সাহেবা (রা.) বর্ণনা করেন যে, প্রায়ই রাতে আমার চোখ খুলে যেত এবং দেখতাম যে, হুযুর(আ.) এর চোখ আপাত বন্ধ থাকলেও তাঁর ঠোঁটে আল্লাহ্র দোয়া ও স্মরণ অব্যাহত রয়েছে।

(রোযনামা আলফজল, রাবওয়া)

সম্মানীয় শ্রোতা! এই সেই একনিষ্ঠ প্রেমিক যিনি ঘুমন্ত অবস্থাতেও তাঁর প্রেমাস্পদকে স্মরণ করে দরুদ শরীফ পাঠ করেন। এই অনুরাগেরই কল্যাণ ছিল যে প্রিয়তম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) তাঁর স্নেহাস্পদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে ঐশী স্বপ্ন ও দিব্য দর্শনে এমনকি জাগ্রত অবস্থায়ও সাক্ষাতের মর্যাদা দান করেছিলেন। এবং তাঁর তাঁর সাথে প্রেম ও স্নেহময় আচরণ করেছিলেন।

এসব স্বপ্ন ও দিব্যদর্শনগুলির রসুল প্রেমের এমন ঈমান উদ্দীপক আখ্যান যা প্রত্যেক শ্রোতার মধ্যে মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার অনুভূতি জাগ্রত করে, সেই সাথে আল্লাহ্ তা'লার সত্তার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ভালবাসা সৃষ্টি করে। এসব স্বপ্ন ও দিব্যদর্শনের অগণিত ঘটনা রয়েছে, তবে সময়কে সামনে রেখে, আমি কেবল একটি দিব্যদর্শনের উল্লেখ করব এখানে।

যৌবনের শুরুর দিকের এরকম একটি ঐশী দর্শনের বর্ণনা তিনি নিজেই এভাবে করেছেন-

"যৌবনের দিনগুলিতে এক রাতে আমি (স্বপ্নে) দেখলাম যে, আমি একটি বিলাসবহুল গৃহে অবস্থান করছি, যেটি অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন এবং সেখানে মাহানবী (সা.)-এর স্মৃতিচারণ এবং আলোচনা চলছে। আমি লোকদের কাছে জানতে চাইলাম যে, আল্লাহ্র রসুল (সা.) কোথায় অবস্থান করছেন? তারা একটা ঘরের দিকে ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর আমি অন্যান্য লোকদের সাথে তার ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং যখন আমি হুযুর (সা.)-এর নিকট পৌঁছলাম তখন হুযুর খুব খুশি হলেন এবং তিনি আমার সালামের উত্তরে আরও উত্তম জবাব দিলেন। আমি এখনও তাঁর সৌন্দর্য, দয়াময় এবং তাঁর সহানুভূতিশীল ও প্রেমময় চেহারা মনে করতে পারি এবং আমি এটি ভুলতে পারি না। তাঁর ভালবাসা আমাকে জয় করে এবং তাঁর মোহময় সৌন্দর্য আমাকে তাঁর প্রতি আকর্ষিত করে। সে সময় তিনি আমাকে বললেন, হে আহমদ! তোমার ডান হাতে কি আছে? ..... আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল, এটা আমার একটা রচনা। মহানবী (সা.) এই পুস্তকের নাম কি তা জিজ্ঞাসা করলে, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! এর নাম কুতুবী। তিনি (সা.) বললেন, তোমার এই বইটা আমাকে দেখাও। মহানবী (সা.) যখন তা গ্রহণ করলেন,তখন তাঁর বরকতময় হাতের স্পর্শে সেটি একটি সুন্দর ফল হয়ে উঠল, যা দর্শকদের কাছে প্রিয় ছিল।

যেভাবে ফল কাটা হয়, হুযুর (সা.) সেভাবে যখন এটি কাটলেন,কাটার সাথে সাথে প্রবাহিত পানির মত স্বচ্ছ মধু বের হয়ে আসল। আমি নবী করীম (সা.)-এর ডান হাতের আঙুল থেকে কনুই পর্যন্ত মধুর সতেজতা দেখতে পেলাম আর দেখলাম মহানবী (সা.) এর হাত থেকে মধু ঝরছে। এমনটা মনে হল যেন, আমাকে চমকে দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে এটা দেখাচ্ছেন। তখন আমার হৃদয়ে একথা জাগরিত হল যে দরজার চৌকাঠের কাছে একজন মৃত ব্যক্তি পড়ে আছে যার নব জীবন এই ফলের মাধ্যমে খোদা তা'লার নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং এটাই নির্ধারিত হয়েছে যে নবী করীম (সা.) তাকে জীবন দান করবেন। এই খেয়ালেই ছিলাম হঠাৎ মৃত লোকটা জীবিত হয়ে দৌড়ে আমার পিছনে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু তার মধ্যে তখনও কিছু দুর্বলতা ছিল যেন সে ক্ষুধার্ত ছিল। তখন মহানবী (সা.) আমার দিকে হাসিমুখে তাকালেন এবং ফলটি টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললেন এবং নিজে এক টুকরো খেয়ে বাকিটা আমাকে দিলেন। এসব টুকরোগুলি থেকে মধু বের হচ্ছিল। মহানবী (সা.) বললেন,হে আহমদ, এই মৃত ব্যক্তিকে এক টুকরো দাও যেন সে এটি খেয়ে শক্তি অর্জন করে। আমি দিলে সে লোভীদের মত সেখানেই এটি খেতে শুরু করল। অতঃপর আমি দেখলাম যে, মহানবী (সা.) এর চেয়ারটি ছাদের আরও কাছে উত্থিত হয়েছে এবং ছাদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। আমি দেখলাম, সেই সময় তাঁর বরকতময় মুখমণ্ডল এমনভাবে উজ্জ্বল হতে লাগল যেন সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ তাতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আমি তাঁর বরকতময় চেহারার দিকে তাকিয়ে ছিলাম এবং ভাববিহ্বল ও আনন্দে আমার অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। তারপর আমি জেগে উঠলাম এবং তখনও আমি খুব কাঁদছিলাম। অতঃপর খোদা আমার অন্তরে এই কথাটি প্রবিষ্ট করলেন যে, সেই মৃত ব্যক্তিটি হল ইসলাম এবং খোদা তাকে মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক অনুগ্রহের মাধ্যমে এখন আমার হাতে জীবিত করবেন। আর তুমি কি জানো, এই সময়টা হয়তো ঘনিয়ে এসেছে। তাই আপনি এটির জন্য অপেক্ষা করুন। আর এই দিব্যদর্শনে মহানবী (সা.) তাঁর বরকতময় হাতে, তাঁর পবিত্র বাণী দ্বারা, তাঁর জ্যোতির্মন্ডলী এবং তাঁর পবিত্র বাগিচার ফল দান করে আমাকে তরবীয়ত করেছেন।

(আয়নাতে কামলাতে ইসলাম)

এমন কোন ধর্ম নেই যা নিদর্শন দেখায়/ আমরা মুহাম্মদের বাগিচা থেকে এই ফল খেয়েছি।

শ্রোতমণ্ডলী! মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓأَيُّهَا
الَّذِينَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থাৎ,আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। হে ঈমানদারগণ! আপনারাও এই নবীর প্রতি অনেক দরুদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

শ্রোতামণ্ডলী! খোদা তা'লার আদেশের আনুগত্য করে মহানবী (সা.) এর প্রতি সর্বাধিক দরুদ প্রেরণকারী সত্তা ছিলেন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)। তিনি বলেন-

"একরাতে এই অধম এত অধিক পরিমাণ দরুদ শরীফ পাঠ করে যে আমার হৃদয় ও আত্মা সুগন্ধিত হয়ে ওঠে। সে রাতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, এই অধমের ঘরে স্বচ্ছ পানির আকারে জোতির্ময়ী মশক এসেছে। এবং তাদের মধ্যে একজন বলল- এগুলি সেই কল্যাণরাজী যা আপনি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রেরণ করেছিলেন।

(রূহানী খাযায়েন)

একটি মজলিসে তিনি (আ.) বলেন, দরুদ শরীফের কল্যাণে আমি দেখি যে, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ এক অদ্ভুত

মহানবী (সা.)-এর বাণী

যখন তোমাদের কাছে কোনও ধর্মপরায়ণ ও নীতিবান ব্যক্তি বিবাহ প্রস্তাব পাঠায়, তখন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে নিও; অন্যথায় পৃথিবীতে অশান্তি ও অরাজকতা তৈরী হবে। (তিরমিযি, কিতাবুন নিকাহ)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rasheed, Basantapur, 24 PGS (s)

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" (খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

জ্যোতির আকারে মহানবী (সা.)-এর প্রতি ধাবিত হয়। অতঃপর সেখানে পৌঁছে তা মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে বিলীন হয়ে যায়। এরপর সেখান থেকে তা বেরিয়ে অন্তহীন নালির আকার ধারণ করে এবং তাদের অংশ অনুযায়ী প্রত্যেক হকদারের কাছে পৌঁছে যায়। নিঃসন্দেহে মহানবী (সা.)-এর মধ্যস্থতা ছাড়া কোন রহমত অন্যদের কাছে পৌঁছতে পারে না। দরূদ শরীফ কী? মহানবী (সা.) এর সেই আরশ (ঐশী সিংহাসন) আলোড়িত করা যার থেকে এই সব জ্যোতির স্রোতধারা প্রস্ফুটিত হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও করুণা লাভ করতে চায়, তার জন্য ঘন ঘন দরূদ শরীফ পাঠ করা আব্যশক যাতে এই অনুগ্রহের মধ্যে স্পন্দন সৃষ্টি হয়।

(আল হাকাম, ২৮ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

আমাকে ইলহামে বলা হল যে, কুল্লু বারাকাতিন মিম মুহাম্মাদিন (সা.) ফাতাবারাকা মান আল্লামা ওয়া তাআল্লামা। অর্থাৎ প্রতিটি কল্যাণই মহানবী (সা.) এর পক্ষ থেকে। অতএব, সবচেয়ে বরকতময় ব্যক্তি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি শিক্ষা দিয়েছেন অর্থাৎ মহানবী (সা.) এবং তারপরে সবচেয়ে ধন্য ব্যক্তি হবেন সেই ব্যক্তি যিনি শিক্ষা লাভ করেছেন, অর্থাৎ বিনয়ী।

শ্রোতামণ্ডলী! হযরত মসীহ মওউদ(আ.)-এর পবিত্র হৃদয়ে ছিল রসুল প্রেমের উদ্বেল সাগর। প্রেমের এই উদ্দীপনায় কখনও কোনও শূন্যতা তৈরী হয় নি। তাঁর অসুস্থতার আরোগ্যও ছিল রসুল প্রেমে নিহিত।

একবার তাঁর এত তীব্র মাথা যন্ত্রণা হয়েছিল যে হাত পা বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। তিনি হযরত মুন্সী জাফর আহমদ কপুরথালবীকে মহানবী (সা.)-এর 'নাত' থেকে কিছু পঙক্তি পাঠ করতে বললেন। মুন্সী সাহেব যখন কয়েকটি পঙক্তি পাঠ করছেন, তখন তাঁর শরীরে গরম প্রভাব আসতে শুরু করে দিয়েছে।

(আসহাবে আহমদ)

শ্রোতামণ্ডলী! রসুল প্রেমের ক্ষমতা ও দরূদ শরীফের কল্যাণ দেখুন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। খোদা তা'লা ইলহামের মাধ্যমে তাঁকে দরূদ শরীফের মাধ্যমে একটি মারণব্যধি থেকে আরোগ্য লাভের পথ্য দান করেন। হযরত মসীহ মওদউ (আ.) বলেন-

"একবার আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ি। এমনকি তিনটি ভিন্ন সময়ে, আমার উত্তরাধিকারীরা আমার জন্য মাসনুন পদ্ধতিতে তিনবার সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করেছিলেন। ভেবেছিলেন এটি আমার শেষ সময়। যখন সূরা ইয়াসীন তৃতীয়বার পাঠ করা হয়,তখন আমি দেখলাম যে আমার কিছু প্রিয়জন, যারা এখন মারা গেছে, দেওয়ালের আড়ালে ব্যকুল হয়ে কাঁদছে। আমার এক ধরণের তীব্র শূল বেদনা ছিল এবং ঘন ঘন রক্তপাত হচ্ছিল। ষোল দিন এভাবেই থাকল এবং একই রোগে আমার সাথের আরেকজন অসুস্থ হয়েছিল। অষ্টম দিনে সে মারা গেল। যদিও আমার মত গুরুতর অসুস্থ ছিল না।

রোগটি যখন ষোড়শ দিনে পৌঁছল, সেদিন একেবারে নিরাশাজনক পরিস্থিতি দেখা দিল এবং আমাকে তৃতীয় বার সূরা ইয়াসীন শোনানো হল। আর সকল প্রিয়জনের অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হল যে, আজ সন্ধ্যা নাগাদ এ কবরে থাকবে।

অতঃপর এমন মনে হল যে, খোদা যেমন তাঁর কিছু নবীকে দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করতে শিখিয়েছিলেন, তেমনি আমাকেও ঐশী বাণীর মাধ্যমে একটি দোয়া করতে শেখান এবং তা হল-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ

আর খোদা তা'লা আমার অন্তরে এই ইলহাম করলেন যে, নদীর জল যার সাথে বালিও থাকবে তার মধ্যে হাত দিয়ে সেই পবিত্র বাক্যটি পাঠ করো আর তোমার বুকে এবং বুকের পিছনে এবং উভয় হাতে এবং মুখ মণ্ডলে বুলিয়ে দাও, এতে তুমি সুস্থ হবে। সেই মত, বালির সংমিশ্রনে থাকা নদীর জল আনা হল এবং আমি আমার শেখানো মত কাজ করতে লাগলাম এবং তখন অবস্থা এমন ছিল যে, আমার এক একটি চুল থেকে আগুন বের হচ্ছিল এবং আমার সমস্ত শরীরে যন্ত্রণাদায়ক জ্বালা পোড়া হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন এই যন্ত্রণা থেকে মৃত্যুই অনেক শ্রেয়।

কিন্তু যখন আমি এই প্রক্রিয়া শুরু করলাম, সেই আল্লাহ্‌র শপথ যার হাতে আমার জীবন যে, যতবার এই পবিত্র বাক্যটি পাঠ করে আমার শরীরে পানির ছিটা পড়েছে, আমি অনুভব করেছি যে দহন জ্বালা ভেতর থেকে বের হয়ে যায় এবং পরিবর্তে তা আরাম ও শীতলতা সৃষ্টি করে। এমনকি পেয়ালার পানি শেষও হয় নি আমি দেখলাম যে রোগটি আমাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে চলে গেছে এবং ষোল দিন পর আমি নিরাময়ের স্বপ্ন নিয়ে রাতে ঘুমিয়েছি। যখন সকাল হল এই ইলহাম পেলাম-

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِشِفَآءٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ

অর্থাৎ আমরা আরোগ্যের দ্বারা যে নিদর্শন দেখিয়েছি সে সম্পর্কে যদি তোমার কোনরূপ সন্দেহ থাকে তাহলে তুমি তার অনুরূপ আরেকটি নিরাময় পেশ কর....

ربط ہے جانِ محمدؐ سے میری جاں کو مدام دل کو وہ جامِ لبالب ہے پلایا ہم نے
مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت اس سے یہ نور لیا بارِ خدایا ہم نے

يَارَبِّ صَلِّ عَلٰى نَبِيِّكَ دَائِمًا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا وَبَعْثٍ ثَانٍ

আমার জীবন মুহাম্মদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, আমার হৃদয় সেই পেয়ালা থেকে পান করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

মোস্তফার উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক, আমরা তাঁর কাছ থেকেই এই জ্যোতি লাভ করেছি।

হে আমার প্রভু! আপনার এই নবীকে পৃথিবীতে এবং পরবর্তী জীবনে সর্বদা আশীর্বাদ করুন।

সুধী শ্রোতামণ্ডলী! হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণের ব্যাপারে খুবই সজাগ থাকতেন। ছোটখাটো বিষয়েও তিনি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ করতেন। তিনি বলেন, " আমার সত্যতার একটি নিদর্শন হল যে আল্লাহ্ আমাকে তাঁর রসুল (সা.)-এর অনুসরণ ও অনুকরণ করার সৌভাগ্য দান করেছেন। অতএব, আমি মহানবী (সা.)-এর এমন কোন বাণী দেখিনি যা আমি পুরণ করি নি এবং আমি এমন কোন কষ্টের পাহাড় দেখিনি যা আমি আরোহন করিনি এবং আমার প্রভু আমাকে সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।"

(আয়েনায়ে কামালাতে্ ইসলাম)

শ্রোতামণ্ডলী! এটা শুধু তাঁর মৌখিক দাবি নয়,তিনি তাঁর বাস্তব উদাহারণ বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করেছেন। সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

হযরত চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ সাহেবের একটি রেওয়ায়েত আছে যে, আমি যখন কাদিয়ানে আসি তখন হযরত সাহেব সবুজ পাগড়ি পরিহিত ছিলেন। হযরত মসীহ মওউদ(আ.) রঙীন পাগড়ি পরে আছেন এটা দেখে আমি খুব অবাক হলাম। আর আমি ইবনে খালদুনের ঘটনাটি পড়লাম যে, যখন মহানবী (সা.) সবুজ পোশাক পরিধান করতেন, তখন তাঁর কাছে অত্যধিক ওহী নাযেল হতো।

(সীরাতুল মাহদী হাদীস)

শ্রোতামণ্ডলী! আপন প্রভুর জীবনশৈলী অনুসরণের কি অসাধারণ দৃষ্টান্ত!

আরেকটি ঘটনা হল, লাঙ্গারওয়ালের হযরত মির্যা দ্বীন মুহাম্মদ সাহেব বর্ণনা করেন যে, ফজরের নামাযের সময় তিনি আমাকে হালকা পানির ছিটা দিয়ে জাগিয়ে দিতেন। একবার আমি জানতে চাইলাম আপনি এমনিই কেন আমাকে জাগিয়ে দিচ্ছেন না? তিনি বললেন, এটা ছিল রসুল করীম (সা.)-এর পদ্ধতি। আমি এই সুন্নতের অনুসরণ করি মাত্র।

(সীরাতুল মাহদী বর্ণনা নং-৪৯২)

মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে (খুব প্রয়োজন না হলে) পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। সম্পাদক সাহেব আল -বদর, গুরুদাসপুরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সফরের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি পানি চাইলেন। পানি এলে তিনি বসে তা পান করলেন এবং অনেকবার দেখা গেছে তিনি বসে পানি পান করতেন।"

একবার,তাঁর মজিলেস একজন অতিথি উঠে দরজা খুলতে চেয়েছিলেন। এটা দেখে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খুব দ্রুত উঠে সেই বন্ধুকে বললেন: থাক, থাক। আমি নিজেই দরজা খুলব। আপনি আমাদের মেহমান এবং মহানবী (সা.) বলেছেন, মেহমানদের সম্মান করতে হবে।

(সীরাতে তাইয়েবা, পৃ: ১১০)

স্ত্রীদের প্রতি উত্তম আচরণ সম্পর্কে মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ এর অর্থ হচ্ছে স্ত্রীদের প্রতি উত্তম আচরণ করে জীবন যাপন কর এবং আমাদের মহান নবী (সা.) বলেছেন- خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার পরিবারের সাথে উত্তম আচরণ করে। 'আমার অবস্থা হল যে একবার আমি আমার স্ত্রীকে চিৎকার করে কিছু বলেছিলাম এবং আমি অনুভব করেছি হৃদয়ের ক্ষোভ থেকে কিছু কথা বের হয়েছিল, তবে আমি কোন কষ্টদায়ক কথা উচ্চারণ করি নি। এরপর আমি দীর্ঘসময় ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করতে থাকি এবং অত্যন্ত নম্রতা ও বিনয়ের সাথে নফল পাঠ করি এবং এছাড়া স্ত্রীর প্রতি এই রূঢ় আচরণ কোন গোপন ঐশী পাপের ফল মনে করে কিছু সাদকাও করি।"

(আল হাকাম ১৭ই জানুয়ারী, ১৯০০)

সম্মানীয় শ্রোতামণ্ডলী! হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আলে মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদ (সা.)এর পরিবারের প্রতি সীমাহীন ভালবাসা ছিল। তিনি বলেন-

جان و دلم فدائے جمالِ محمدؐ است خاکم نثار کوچۂ آلِ محمدؐ است

অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর সৌন্দর্যের প্রতি আমার আত্মা ও হৃদয় উৎসর্গীত, এবং আমার ছাই মুহাম্মদের পরিবারের পথে নিবেদিত।"

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম)

হযরত সৈয়্যদা নবাব মুবারকা বেগম সাহেবা (রা.)-এর একটি রেওয়ায়েত আছে যে, মহররম মাসে হুযুর (আ.) তাঁর সন্তানদের নিকট মহানবী (সা.)এর নাতি হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদতের বৃত্তান্ত বর্ণনা করছিলেন এবং সেই সময় তাঁর চোখ

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

অশ্রুসিক্ত ছিল এবং তিনি আঙুল দিয়ে তাঁর অশ্রু মুছছিলেন আর অত্যন্ত বেদনাদায়ক কণ্ঠস্বরে বড় দুঃখের সাথে বলছিলেন: ঘৃণিত ইয়াজিদ আমাদের নবীর নাতির সাথে এই নিষ্ঠুরতা করেছিল। কিন্তু খোদাও এই অত্যাচারীদেরকে তাঁর শাস্তিতে খুব দ্রুত পাকড়াও করেছিলেন। " তখন তাঁর উপর এক অদ্ভুত অবস্থা বিরাজ করছিল এবং তাঁর মনিবের কলিজার টুকরোর এ হেন মর্মান্তিক শাহাদতের কথা ভেবে তাঁর হৃদয় খুবই অস্থির হয়ে উঠছিল। এটা মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর ভালবাসার কারণে হয়েছিল।

হযরত ডাঃ সৈয়্যদ আব্দুল সাত্তার সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর মসজিদে মাটিতে বসেছিলেন। হুযুর এর দৃষ্টি সৈয়্যদ সাহেবেদের দিকে পড়ে। তিনি সৈয়্যদ সাহেবকে বিশেষভাবে বললেন, আপনি এসে আমার খাটিয়ায় বসুন, কারণ আপনি সৈয়্যদ এবং আমরা আপনাকে সম্মান করি"

সুধী দর্শক! রসুল প্রেমের কল্যাণে ঐশী নিয়তি ও খোদায়ী উদ্দেশ্যের অধীনে সাদাত পরিবারে তাঁর বৈবাহিক সম্বন্ধ নির্ধারিত হয়েছিল এবং এই বরকতময় রিশতা থেকে তাঁকে বরকতময় সন্তান দান করা হয়েছিল।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের বর্ণনায় আছে যে, একবার ঘরোয়া পরিবেশে হজ্জের কথা শুরু হলে হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব এমন কথা বললেন যে, এখন হজ্জের সফরের সুবিধা তৈরী হচ্ছে, হজ্জে যেতে হবে। তখন মক্কা-মদিনার দর্শনের কথা স্মরণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চোখ জলে ভরে উঠল এবং তিনি আঙুল দিয়ে চোখের জল মুছতে লাগলেন। তিনি বললেন, 'এটা ঠিক কথা এবং আমারও আন্তরিক ইচ্ছা আছে, কিন্তু আমি ভাবছি যে আমি মহানবী (সা.)-এর মাজার দেখতে পাব কি না।এটি একটি সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে একটি আপাতদৃষ্টিতে ছোট জিনিস ছিল, তবে আপনি যদি এটা বিবেচনা করেন, তবে এতে অতল সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গারাশি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে খেলা করতে দেখা যায়। কার না হজ্জে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সেই ব্যক্তির অসীম ভালবাসার কথা চিন্তা করুন যার আত্মা হজ্জের কল্পনায় মহানবী (সা.)-এর মাজারে পৌঁছয় (ফিদাহ নফসি) এবং তাঁর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়।

(সীরতে তৈয়্যবা)

শ্রোতামণ্ডলী! হযরত মসীহ মওউদ (আ.) স্বভাবগুণেই অত্যন্ত নম্র, সহনশীল এবং সহানুভূতি ও ভালবাসার মূর্তপ্রতীক ছিলেন। কিন্তু প্রিয় মনিবের সম্মানে ঔদ্ধত্য বা অসভ্যতার কথা শুনলে তিনি তৎক্ষণাৎ রেগে যেতেন। একবার,বিরোধীদের খারাপ ভাষা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'এই বিরোধিদের হৃদয় বিদারক কটুক্তি এবং অপমান, যা তারা হযরত শ্রেষ্ঠ মানব মহানবী (সা.)-এর চরিত্রের বিরুদ্ধে করে, তা আমার হৃদয়কে মারাত্মকভাবে আহত করেছে। খোদার কসম, যদি আমার সকল সন্তান-সন্ততি এবং আমার সকল বন্ধু-বান্ধব এবং আমার সকল সাহায্যকারী ও সহায়কে আমার চোখের সামনে হত্যা করা হয় এবং আমার নিজের হাত-পা কেটে ফেলা হয় এবং আমার চোখের মণি বের করে দেওয়া হয় এবং আমি যদি আমার সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলি। আমি আমার ইচ্ছা থেকে বঞ্চিত এবং আমার সমস্ত সুখ এবং আমার সমস্ত আরাম থেকে বঞ্চিত করা হয়,তারপরও এই সমস্ত কিছুর বিপরীতে এই ধাক্কা আমার জন্য আরও ভারী যে, মহানবী (সা.)-এর উপর এমন অপবিত্র আক্রমণ করা হয়।"

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম)

এছাড়া বলেন, 'আমি সত্য সত্য বলছি যে আমি জমীনের সাপ ও প্রান্তরের নেকড়েদের সাথে সন্ধি করতে পারি, কিন্তু এই মানুষগুলো- আমরা তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করতে পারি না যারা আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর উপর অপবিত্র আক্রমণ করে, যিনি আমার নিজের জীবন ও পিতামাতার চেয়েও প্রিয়তম।"

(শান্তির বার্তা)

শ্রোতামণ্ডলী! হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর গুরু ও শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রতি যে সত্যিকার ও অতুলনীয় ভালবাসা রাখতেন গোটা বিশ্ব তার সাক্ষী। আমাদের নিজেদের সাক্ষীরাও তা প্রত্যক্ষ করেছে এবং অন্যরাও তা স্বীকার করেছে। উর্ধ্বজগতের ফেরেশতাগণ এর সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্য এক জীবনদানকারী খুঁজতে গিয়ে ফেরেশতাগণ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দিকে ইঙ্গিত করে এই সাক্ষ্য দেয়: هٰذَا رَجُلٌ يُحِبُّ رَسُوْلَ। অর্থাৎ এই ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে ভালবাসেন। একথার অর্থ এটাই ছিল যে, এই অবস্থানের প্রধান শর্ত হল রসুলকে ভালবাসা। যা এই ব্যক্তির মধ্যে উপলব্ধি করা যায়। "

(বারাহীনে আহমদীয়া , ৪র্থ খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৯৮)

হযরত মীর মহম্মদ ইসমাঈল সাহেব প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য দেন যে:

"আমি তাঁকে দেখেছিলাম যখন আমি দু' বছরের শিশু ছিলাম, তারপর তিনি আমার চোখের আড়াল হয়ে গেলেন যখন আমি ২৭ বছরের যুবক ছিলাম, কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি যে তাঁর থেকে অধিক আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল (সা.)-এর ভালবাসায় এতটা নিমজ্জিত কাউকে দেখিনি। যদি হযরত আয়েশা মহানবী (সা.) সম্পর্কে এই সত্য কথা বলেছিলেন كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ তবে আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সম্পর্কে একইভাবে বলতে পারি كَانَ خُلُقُهُ حُبَّ مُحَمَّدٍ وَّ اَتْبَاعِهٖ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام-"

(সীরাতুল মাহদী)

শ্রোতাবৃন্দ! উপমহাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব মির্যা ফারহতুল্লাহ্ বেগ সাহেবের একটি সাক্ষ্য শোনার মত। তিনি লিখেছেন যে তাঁর চাচা, মির্যা এনায়েতুল্লাহ্ বেগ, একবার তাঁকে নির্দেশ দেন যে, যখন তুমি মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাবে, তখন তাঁর চোখগুলো ভালো করে পর্যবেক্ষন করে এসো। তিনি লেখেন, 'আমি কাদিয়ান গিয়েছিলাম। হুযুরের চোখগুলো গভীরভাবে দেখলাম এবং দেখলাম যে, তাঁর চোখে সবুজ রঙের পানি ঘুরছে। আমি ফিরে এসে চাচাকে বিষয়টি বললাম, তখন তিনি বললেন,

'ফারহাত! এই ব্যক্তিকে কখনো খারাপ বলো না। তিনি এক ফকির এবং হযরত রসুল করীম (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক। '

মির্জা ফারহতুল্লাহ্ বেগ সাহেব লেখেন, 'আমি চাচাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কিভাবে এটি জানলেন? তখন তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর প্রেমে সর্বদা মগ্ন থাকে, তার চোখে সবুজ রঙের ছাপ এবং সবুজ ঢেউ দেখা যায়। '

(তারিখে আহমদীয়াত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬২)

১৮৮৬ সালে বোম্বাইয়ের শেঠ ইসমাঈল আদম সাহেব তার পীর রশীদউদ্দীন সাহেবের কাছে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দাবির বিষয়ে পরামর্শ চান। পীর সাহেব তার উত্তরে তিনটি সাক্ষ্য উল্লেখ করেন। একটি ছিল এরূপ:পীর সাহেব লিখেছেন, 'স্বপ্নে আমি হযরত রসুল করীম (সা.) কে দেখলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম যে, হুযুর,মৌলভীরা এই ব্যক্তির (মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) বিরুদ্ধে কুফরের ফতোয়া দিয়েছে এবং তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। তখন মহানবী (সা.) বললেন:

'দর ইশকে মা দিওয়ানা শুদা আস্ত' অর্থাৎ তিনি আমার ভালবাসায় বিভোর হয়ে গেছেন।

(মাকতুবাতে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬২)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র,হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব, যিনি সর্বদা কাছ থেকে তাঁকে দেখেছেন, সাক্ষ্য দিয়েছেন যে,মহানবী (সা.) -এর প্রতি আমার পিতার যে প্রেম ছিল, তেমন প্রেম আমি কখনো কারো মধ্যে দেখি নি।

(সীরাতে মাহদী, ১মখণ্ড,পৃ:২০১)

সুধী দর্শক! সত্যিকারে প্রেমিক, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়াতে আসার পর তাঁর সান্নিধ্য এবং আধ্যাত্মিক প্রভাবের কারণে তাঁর সাহাবাদের মধ্যেও হযরত রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি অপরিসীম প্রেমের আবেগ প্রকাশ পেয়েছে।

হযরত মৌলানা গুলাম রসুল রাজেকী (রা.) উল্লেখ করেন যে, একবার নবাব খান সাহেব তহসিলদার হযরত মওলানা নূরুদ্দিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মওলানা, আপনি তো আগে থেকেই একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন। হযরত মির্যা সাহেবের বয়াতে আপনার কি বিশেষ উপকার হয়েছে?'

তখন হযরত মওলানা সাহেব বললেন,'নবাব খান ! আমি হযরত মির্যা সাহেবের বয়াতে অনেক উপকার পেয়েছি, কিন্তু একটি বিশেষ উপকার হল- 'আগে আমি স্বপ্নে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর দর্শন পেতাম, কিন্তু এখন জাগ্রত অবস্থাতেও পাই। '

(হায়াতে নূর, লেখক-শেখ আব্দুল কাদের, পৃ: ১৯৪)

হযরত মওলানা হাসান আলী সাহেব (রা.) বলেন:

"আমি মৃত ছিলাম, কিন্তু এখন জীবিত হয়েছি। কুরআন শরীফের যে মহিমা এখন আমার অন্তরে রয়েছে, তা আগে কখনও ছিল না। মহানবী (সা.)-এর প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এখন আমার অন্তরে রয়েছে, তা আগে ছিল না। এসবই হযরত মির্যা সাহেবের বদৌলতে। যদিও আমার দেহ ভাগলপুর বা বঙ্গালায় থাকে, কিন্তু আমার আত্মা সর্বদা কাদিয়ানে থাকে। আলহামদোলিল্লাহ্ এজন্য।"

(আসহাবে আহমদ, খণ্ড- ১৪, লেখক- মালিক সালাহউদ্দিন,পৃ: ৫৮)

শেষ যুগের একজন শহীদ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হযরত শাহযাদা আব্দুল লতিফ (রা.) আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল (সা.) এবং ইমাম মাহদীর প্রতি ভালবাসায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর আত্মত্যাগ বিশ্ব ধর্মের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় রচনা করেছে।

সৈয়্যদ আহমদ নূর সাহেব বলেন, 'কাদিয়ানে হযরত সাহেবযাদা (রা.) স্বপ্ন এবং ইলহাম পেতেন। একদিন তিনি ঘুম থেকে উঠে বলেন,'আমি স্বপ্নে মহানবী (সা.) কে দেখেছি এবং এই ইলহাম পেয়েছি:

جِسْمُهٗ مُنَوَّرٌ مُعَبَّرٌ مُعَطَّرٌ يُضِيئُ كَاللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْن-

কাবুলে যখন তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের জন্য

এরপর ২৩ পাতায়....

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তুমি বল,'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa Sb., Berhampur, Murshidabad

দাওয়াতে ইলাল্লাহ্-র জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবেগ

-শেখ ফাতেহুদ্দীন সাহেব, এডিশিনাল মুবাল্লিগ, দিল্লী অনুবাদক: রফিকুল ইসলাম (এম.এ) মুরুব্বী সিলসিলা বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ-
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

হে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী খোদা! আমাকে এমন এক উত্তম নৈতিকতা দান কর, যারপরনায় ধর্মীয় যাতনায় আমি এক উন্মাদের ন্যায় হয়ে যাই। ধর্মের জন্য তুমি আমার হৃদয়ে এমন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর যার অনন্ত শিখা যেন সর্বদা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।)

এখন আপনাদের সামনে সূরা আল-আনআমের ১৬৩ নং আয়াত এবং সূরা আহযাবের ৪৭ নং আয়াতের তেলাওয়াত করা হয়েছে। যার অনুবাদ হল-

তুমি বলে দাও, নিশ্চয় আমার ইবাদত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ সব কিছুই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান সূর্য হিসেবে।

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং বিশিষ্ট সুধীবৃন্দ! আস সালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু।

আপনারা ইতিমধ্যে শুনেছেন আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু হল, 'দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আবেগ, হুযুর আনোয়ার (আই.) সদুপদেশ এবং আহমদীয়া জামাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য।"

সৈয়্যদানা হযরত আকদাস মসীহ মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

"এটি জীবনের ঋণ যা আপনাকে রক্ষা করবে। আমি কী করব আর কীভাবে এই সুসমাচার হৃদয়ে প্রোথিত করব?কোন ঢাক বাজিয়ে বাজারে প্রচার করব যে, এটা তোমাদের খোদা, যাতে লোকেরা শোনে এবং কোন ওষুধ দিয়ে এর চিকিৎসা করব যাতে শোনার জন্য মানুষের কান খোলে?

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯.পৃ:২২)

শ্রোতামণ্ডলী! বক্তৃতার শুরুতে আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি, তাতে আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রভু ও মালিক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর আল্লাহ্‌র মধ্যে লীন হয়ে যাওয়ার সেই মহান মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে যা অনন্য ও অদ্বিতীয়। মহানবী (সা.) এর পবিত্র জীবনের এমন চিত্তাকর্ষক নকশা বর্ণনা করা হয়েছে যা সকল দিক হতে অদ্বিতীয় ও অনন্য। আল্লাহ্ তা'লা এই শেষ যুগে রসুলে পাক (সা.) এর আধ্যাত্মিক মহান পুত্র ও তাঁর প্রকৃত প্রেমিককে এই সৌভাগ্য দান করেছেন যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর প্রভু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রঙে রঙীন হয়েছিলেন এবং কিছুটা এমন বিলীন হয়েছিলেন যে, এই হেদায়াতের চন্দ্র স্বীয় সত্তায় হেদায়াতের সূর্যের একটি নিঁখুত ও সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তৈরী করেছিলেন। মহানবী (সা.) এর দাস তাঁর প্রভু (সা.)-এর পূর্ণ প্রতিচ্ছায়াতে পরিণত হন। তাঁর জীবন দুজাহানের প্রভুর দাসত্বে পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে এই পবিত্র আয়াতের এক জীবন্ত মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

শ্রোতাবন্দ! হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর মধ্যেও ধর্মীয় মর্যাদা ও ইসলাম প্রচারের সেই একই ব্যকুলতা বিরাজমান ছিল যা একসময় হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।.... তাঁর মধ্যে একই ব্যাথা ছিল যা কখনও প্রিয় নবী (সা.)-এর ধর্মের জন্য অনুভব করতেন..... ধর্মের বেদনাদায়ক পরিস্থিতির জন্য তিনি (আ.)ও তেমনই কষ্ট পেতেন, যেমন নবী আকরাম (সা.) ধর্মের বেদনাদায়ক পরিস্থিতির জন্য ব্যথিত হতেন। ..... তিনি (আ.)ও ধর্মের সেবায় তেমন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন যেমন দুঃখ-কষ্ট একদা মহানবী (সা.) ভোগ করেছিলেন। আল্লাহ্‌র ধর্ম প্রচারের জন্য মহানবী (সা.) কে উন্মাদ ও জাদুগর পর্যন্ত বলা হয়েছে। ঠিক তেমনই হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) কে কাফের দাজ্জাল নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে যেমন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে পড়ে থাকতে দেখা গেছে, ঠিক তেমনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কেও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সময় আল্লাহর সমীপে সেজদাবনত হয়ে থাকতে দেখা গেছে।.... সুতরাং, মহানবী (সা.) এর প্রকৃত দাস হওয়ার আঙ্গিকে তিনি (আ.) তাঁর প্রভু ও প্রেমাস্পদ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)এর রঙে রঙ্গীন হয়েছিলেন। এই সব কিছুই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর সঙ্গে তাঁর প্রিয় প্রভুর সাদৃশ্যকে নির্দেশ করছে। তাঁর (আ.) ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ তাঁর কবিতায় দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রোতাবৃন্দ! আমি আপনাদের সম্মুখে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর অন্তরে বিদ্যমান দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র প্রতি আবেগ ও উৎকণ্ঠা বর্ণনা করার পূর্বে বর্তমানে ইসলামের অবস্থা পর্যালোচনা করা ও ইসলামের নৌকা কোন ঘোর তুফানে বেষ্টিত ছিল তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা সঙ্গত হবে।

১৮৯০ সাল ছিল সেই সময় যখন খ্রিস্টধর্ম ভারতকে গ্রাসে পরিণত করেছিল, সর্বত্র খ্রিষ্টধর্মের প্রচার কার্যক্রম ছিল প্রবল। মুসলমানরা ছিল সম্পূর্ণ অসহায় এবং খ্রিষ্টীয় আগ্রাসন তাদের খড়কুটোর ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর অন্তরে যে বেদনার উদ্রেক হয়েছিল এবং ইসলামের সেবার যে অমোঘ আবেগ প্রকাশ পেয়েছিল, তাঁর এই বেদনাদায়ক লেখনী হতে সেই পরিস্থিতির আন্দাজ লাগানো সম্ভব। তিনি লেখেন-

এটা কি সত্য নয় যে, এই ভারত দেশে অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ্য মানুষ খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে, বড়ই সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা তাদের পবিত্র ধর্ম পরিত্যাগ করেছে, এমনকি যাদেরকে রসুলের উত্তরসূরী বলা হত তারা খ্রিষ্টীয় পোশাক পরিধান করে রসুলের শত্রুতে পরিণত হয়েছিল? ..... মহানবী (সা.)-এর পক্ষে এ প্রকার অশালীন, লাঞ্ছনাকর ও অপবাদমূলক বই পুস্তক ছাপানো হয় ও প্রকাশ করা হয় , যা শুনে হৃদয় কেঁপে ওঠে এবং হৃদয় ক্রন্দনরত অবস্থায় সাক্ষ্য দেয় যে, এই লোকেরা যদি আমার চোখের সামনে আমার সন্তানদের হত্যা করত আর আমার ইহজগতের সর্বাধিক প্রিয় আত্মীয় পরিজনদের খণ্ড বিখণ্ড করা হত এবং বড় লাঞ্ছনার সাথে আমাকে হত্যা করা হত..... আমার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করত, তবে আল্লাহ্‌র কসম! আমার দুঃখ হত না এবং আমার হৃদয় এতটা আঘাত পেত না যা আমাদের রসুল (সা.) কে গালি ও অবমাননার কারণে ব্যথিত হয়েছে। ইসলামের এই দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বুকে যে বেদনা জন্মেছিল তা বর্ণনার উর্দ্ধে।

যে যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে সময় সর্বদিক থেকে ইসলাম ও ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা (সা.)-এর উপর হৃদয়বিদারক আক্রমণ চলছিল, কিন্তু তিনি (আ.) আল্লাহ্ সাহায্য ও সমর্থনে উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও বীরত্বের সাথে সত্য প্রচারের কাজ সুসম্পন্ন করেছেন তার দৃষ্টান্ত আমরা আর কোথাও পাই না। সেই সঙ্গে তাঁর ইসলামের সেবা ও ব্যকুলতার এই মহান আখ্যান যা বেদনাতুর অশ্রু সহযোগে উল্লেখ করার যোগ্য। এই আকুলতা ও উদ্বেগকে তিনি (আ.) তাঁর লেখনী ও কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই বারংবার উল্লেখ করেছেন। আর এটাই বাস্তবতা যে,তিনি তাঁর সম্পূর্ণ জীবন মহানবী (সা.)এর ধর্ম প্রচার এর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি বলেন-

মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ধর্মের জন্য আমার জীবন উৎসর্গ। এটাই আমার আন্তরিক চাহিদা,হায়! আমি যদি এই লক্ষ্যটি অর্জন করতে পারি।

১৮৮৫ সালে, সত্য প্রচারের লক্ষ্যে তাঁর ব্যকুলতা তখনও প্রকাশ পেয়েছিল যখন হযরত সুফি আহমদ জান সাহেব লুধিয়ানভি হজ্জ করতে যাচ্ছিলেন। তিনি (আ.) তাঁকে নিম্নোক্ত দোয়া লিখে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন বিশেষ করে কা'বা শরীফ ও আরাফাতের ময়দানে এই দোয়াগুলি পাঠ করেন। সেই বেদনাতুর দোয়াগুলি হল,

"হে পরম করুণাময় খোদা! যে কাজের জন্য তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ এবং যে সেবার জন্য তুমি আমার হৃদয়ে উৎসাহ সঞ্চার করেছ, তাকে তুমি তোমার কৃপায় পূর্ণ কর। বিরুদ্ধবাদী এবং যারা ইসলামের গুণাবলী সম্পর্কে এখনও অজ্ঞ তাদের সকলের উপর এই অধমের হাতে ইসলামের অকাট্য যুক্তি পূর্ণ কর।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৫)

সুধী শ্রোতাবৃন্দ! এটা এমন সময় ছিল যখন চতুর্দিক হতে ইসলামের উপর আক্রমণ করা হচ্ছিল এবং ইসলামের জাহাজ এক ঘুর্ণিতে আটকা পড়েছিল বলে মনে হচ্ছিল। ইসলামের জন্য উদ্বেগ, যাতনা ও উৎকণ্ঠার সেই যুগ ছিল যন্মধ্যে আহমদীয়াতের জ্যোতি উদিত হয় এবং ইসলামের পুনরুজ্জীবনের মহান আন্দোলন গড়ে ওঠে।.... শৈশব থেকেই ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি তাঁর খোদা-প্রদত্ত অগাধ ভালবাসা ছিল ও আল্লাহ্ ইবাদতের প্রতি একনিষ্ঠতা তাঁর অন্তরে প্রোথিত ছিল। মসজিদের প্রতি তাঁর এমন ভালবাসা ছিল যে,কখনও কখনও তাঁর পিতাকে তিনি কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি উত্তর দিতেন,যাও মসজিদে গিয়ে দেখ (হয়তো) সেখানে শুয়ে পড়ে আছে।

(সওয়ানেহ ফজলে উমর)

তাঁর মধ্যে প্রচার ও হেদায়াতের জন্য এ পরিমাণ উৎসাহ বিদ্যমান ছিল যে, তা অনুমান করা মানুষের চিন্তা ও বোধগম্যতার বাইরে। তিনি (আ.) তাঁর লেখনীর মধ্যে এই ব্যকুলতা বহুবার প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন-

"আমি সেই পরম প্রভুর কাছে কৃতজ্ঞ এই কারণে যে, তিনি আমাকে ইসলাম প্রচারের জন্য ঈমানী উদ্দীপনা এতটাই প্রদান করেছেন যে, যদি এই পথে আমার জীবনও বিসর্জন দিতে

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB

হয়, তথাপি সর্বশক্তিমানের কৃপায় এই কাজটি আমার জন্য কোন ভারি কাজ নয়। যদিও আমি এই পৃথিবীর মানুষের থেকে সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর আমার আশা অত্যন্ত প্রবল। অতএব, আমি জানি, যদিও আমি এক, তবুও আমি একা নই। সেই পরম সত্তা আমার সাথে আছেন এবং তাঁর থেকে বড় কেউ আমার প্রিয় নয়। একমাত্র তাঁর কৃপায় আমি তাঁর দ্বীনের খেদমত করার এবং আন্তরিকতার সাথে সমস্ত ইসলামের তবলীগ সুসম্পন্ন করার জন্য এই প্রেমময় মনোভাব পেয়েছি। তিনি আমাকে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করেছেন,এখন কারও কথায় আমাকে থামানো যাবে না..... এবং আমি চাই আমার সারা জীবন এই সেবায় ব্যয় হোক। আর প্রকৃতপক্ষে আনন্দময় ও কল্যাণময় জীবন তাই যা ঐশী ধর্মের সেবা ও প্রচারের জন্য অতিবাহিত হয়।"

(আইনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৩৫-৩৬)

শ্রোতামণ্ডলী! হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হল, ইসলাম ধর্মের নবায়ন এবং মহানবী (আ.)-এর পবিত্র জীবনীর উপর আমল করে বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করা। তিনি (আ.) বলেন," আমার ক্ষমতা থাকলে ভিক্ষুকের ন্যায় মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোদা তা'লার সত্য ধর্মের প্রচার করতাম এবং বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া ধ্বংসাত্মক শিরক ও কুফর থেকে মানুষকে রক্ষা করতাম। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ আমাকে ইংরেজি ভাষা শেখান, তাহলে আমি নিজেই বাড়ি বড়ি গিয়ে এবং সফর করে তবলীগ করতাম এবং আমাকে হত্যা করা হলেও এই তবলীগ করতে করতে জীবন শেষ করে দিতাম।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ; ২১৯)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ধর্ম ও হেদায়াতের প্রকাশের জন্য নিবেদিত ছিল যাতে সত্যের সন্ধানকারীদের জন্য আধ্যাত্মিক জীবন উপলব্ধ করা যায়। তাঁর জীবনের এই দিকটি সৌন্দর্যময় ও চিত্তাকর্ষকও বটে। একটি চকচকে হীরের ন্যায়, যেদিক হতে দেখা যাক না কেন নব আঙ্গিকে তার সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। তাঁর ইসলামের প্রতি ব্যকুলতা ও ইসলামের তবলীগ তাঁর পুরো জীবনকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। এটিই ছিল তাঁর জীবনের সঙ্গী এবং জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই জন্যই তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন এবং এতে তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করেছেন। সুতরাং হযরত মৌলবী ফতেহ দ্বীন সাহেব ধরম কোটি (রা.) বলেন-

"আমি প্রতিশ্রুতি মসীহ (আ.)-এর সান্নিধ্যে প্রায়ই থাকতাম এবং তাঁর পাশে অনেক রাত কাটিয়েছি। একদা দেখলাম মধ্যরাতে হযরত সাহেব খুব অস্থির হয়ে ঘরের একপ্রান্ত থেকে অস্থির পায়ে পায়চারি করছেন,যেমন জলবিহীন মাছ কিংবা অসুস্থ ব্যক্তি প্রচণ্ড ব্যাথায় কষ্ট পায়। এই অবস্থা দেখে আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম এবং খুব চিন্তিত হয়েছিলাম এবং এমন কিছু ভয় আমার মনে দাগ কাটে যে, আমি তখন দুশ্চিন্তায় স্তব্ধ হয়ে পড়েছিলাম। এক সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর এই অবস্থা দূরীভূত হয়।

সকালে আমি হুযুর(আ.)-এর কাছে এ ঘটনা উল্লেখ করলাম যে, রাতে আমি এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি। আপনার কি কোন কষ্ট হচ্ছিল বা প্লীহা ইত্যাদিতে যন্ত্রণা হচ্ছিল?হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন," মিঞা ফতেহ দ্বীন! আপনি কি সেই সময় জেগে ছিলেন? আসল কথা হল, ইসলামের মহান কর্মকাণ্ডের কথা যখন আমার মনে পড়ে এবং বর্তমানে ইসলামের উপর আপতিত বিপর্যয়ের কথা চিন্তা করি তখন আমি খুবই অস্থির হয়ে উঠি এবং ইসলামের বেদনাই আমাকে অস্থির করে তোলে।"

(সীরাতুল মাহদী,তৃতীয় খণ্ড,পৃ:২৯)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে সমস্ত বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেছিলেন এবং তবলীগের জন্য নিত্য নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তার বিশদ বিবরণে যাওয়া সম্ভব নয়, তবে সেগুলির প্রতি ইঙ্গিত না করে এগিয়ে যাওয়া যথোচিত বলে মনে হচ্ছে না। অতএব, সময়ের দিকে দৃষ্টি রেখে কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করছি-

তিনি (আ.) সর্বপ্রথম ব্যাথাতুর হৃদয়ে দোয়া করেছিলেন।ইসলাম, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা এবং পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে ৮৫টিরও অধিক পুস্তক রচনা করেছেন। সেই সঙ্গে নমযও লিখেছেন যা এক আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডার। ইশতেহার প্রকাশ করেছেন,ধর্মীয় তর্কযুদ্ধ করেছেন, পার্থিব রাজা-বাদশাহ ও নেতা-নেত্রীদের নিকট পত্র প্রেরণ করেছেন, দূর দূরান্তের পথ পাড়ি দিয়েছেন,সভা করেছেন,জলসার ব্যবস্থা করেছেন, সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছেন, পত্র-পত্রিকা প্রকাশের সূচনা করেছেন। মসীহ মওউদ (আ.) লঙ্গর খানা প্রতিষ্ঠা করেন যাতে মানুষ তাঁর কাছে এলে তাদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান ও খাবারের ব্যবস্থা করা যায়। সাহাবাদের প্রস্তুত করেছেন এবং তাদের মধ্যেও তবলীগ করার উৎসাহ সৃষ্টি করেছেন। সাহাবারা জাগতিক লাঞ্ছনাকে সম্মান ও পার্থিব দুঃখকে স্বস্তি মনে করতেন,এর দৃষ্টান্ত তখন উপলব্ধি করা যায় যখন মওলানা বুরহানুদ্দীন জেহেলমী কোন সফরে পিছনে পড়ে যান। বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে ধরে ফেলে ও তাঁর উপর অত্যাচার করা শুরু করে, তাঁর মুখে গোবর প্রবেশ করায়, কিন্তু এটা তো ছিল তাঁর তবলীগের উদ্দীপনা যে এতদসত্ত্বেও তিনি মুখে উফ্ শব্দ পর্যন্ত করেন নি, বরং তিনি এই বিষয়টিকে আশীর্বাদ মনে করে বললেন - 'অ্যায় বুরহানীয়া এ নে'মাতাঁ কিতথোঁ'!! অর্থাৎ হে বুরহানুদ্দীন! এসব আশীর্বাদ কোথায় পাওয়া যাবে? অর্থাৎ ধর্মের জন্য কি কাউকে কখনও দুঃখ দেওয়া হয়! এটা তো সৌভাগ্য। এগুলি সবই মসীহ মওউদ(আ.)-এর মনোমুগ্ধকর প্রচারশৈলীর বিভিন্ন বিষয়, এখানে যার বিস্তারিত বলার সময় নেই।

মহোদয়গণ! এই যুগে ইমামের আন্তরিক অবস্থা সম্পর্কিত একটি চমকপ্রদ ঘটনা উপস্থাপন করছি।

একবার কাদিয়ানে প্রচণ্ড গরম পড়ে। রাস্তাঘাট ছিল জনশূন্য। বাজার বন্ধ হয়ে যায়। এমন উত্তাপ যে সকলে শান্তি স্বস্তি বলে হাহাকার করছিল। হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোটি প্রচণ্ড গরমের কথা উল্লেখ করে তাঁর মধুর ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বলেন,'গরম এতই প্রচণ্ড ছিল যে, সব মানুষের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে ওঠে, এমনকি আল্লাহ্‌র যন্ত্রও থেমে যায়।অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যিনি কোন ঋতুতেই কাজ করে ক্লান্ত হতেন না,তিনিও বিশ্রাম নিতে বাধ্য হন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন এ সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন তিনি বললেন, এই আবহাওয়াতে আমি এক মুহূর্তের জন্যও কাজ বন্ধ করি নি।

(হযরত মুফতি মুহাম্মদসাদিক (রা.) প্রণীত যিকরে হাবীব,পৃ:১৬১)

শ্রোতামণ্ডলী! বহুবার এমন হয়ে থাকে..... আমাদের মধ্যে অনেকেই এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছেন যে, শিশুরা তাদের পিতামাতার কাছে আবদার করে থাকে..... অভিভাবকরা কখনও পূর্ণ করেন... আবার কখনও তা নিষেধ করে দেন আবার কখনও বকা-ঝকাও করেন। যদিও এর মধ্যে শিশুদের কল্যাণ নিহিত। বহুবার এমন হয় যে বাচ্চাদের নিষেধ করার পর তাদের মনের অবস্থা দেখে বা তাদের মাসুম চেহারা দেখে মায়া হয় যে, এটি তো আমারই সন্তান। অতঃপর নিষেধ করা সত্ত্বেও তাদের দাবি পূরণ করে থাকি। এটি তো জাগতিক স্নেহ ও ভালবাসার এক নগণ্য দৃষ্টান্ত। এর পরিবর্তে ঐশী স্নেহ ও ভালবাসার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কলমের জেহাদে নিয়োজিত ছিলেন। এজন্য তাঁকে বহুবার অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ সম্পর্কে মুনশী জাফর আহমদ কপুরথালভী বর্ণনা করেন-

"একবার হযরত আকদাসের প্রচণ্ড চুলকানির সমস্যা দেখা দেয় এবং তাঁর সমস্ত হাত ভরে গিয়েছিল। লেখা বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করা কঠিন হয়ে উঠেছিল। তিনি সমানে চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু চুলকানি দূর হচ্ছিল না। একদিন আমি হুযুরের খিদমতে হাজির হলাম। তখন ছিল প্রায় আসরের সময়। আমি দেখি, তাঁর হাত সম্পূর্ণ পরিষ্কার, কিন্তু তাঁর দুই চক্ষু বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি, হুযুর! আপনি আজ অযথা কেন ক্রন্দন করছেন? হুযুর (আ.) বলেন, আমার অন্তরে একটা পাপের চিন্তার উদ্রেক হয় যে, আল্লাহ্‌ তো আমার উপর এত বড় একটা দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং অন্যদিকে স্বাস্থ্যের অবস্থা এমন যে, প্রতিদিন একটা না একটা সমস্যা লেগেই আছে। তখন আমার উপর ইলহাম হয় 'হামনে তেরী সেহাত কা ঠিকা লিয়া হ্যায়' (অর্থাৎ আমরা কি তোমার স্বাস্থ্যের ঠেকা নিয়ে রেখেছি?)

এটি আমার হৃদয়কে চরমভাবে ব্যথিত ও বিস্ময়ে পূর্ণ করেছে যে, আমি কেন এমন খেয়াল করছিলাম। একদিকে এই ইলহাম হয়েছে, কিন্তু যখন আমি জেগে উঠি, তখন আমার হাত সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায় এবং চুলকানির কোনো চিহ্নমাত্র নেই। একদিকে তাঁর প্রতাপময় ইলহামকে দেখছি আর অন্যদিকে তাঁর করুণা ও অনুকম্পা, আল্লাহ্‌ তা'লার মাহাত্ম্য ও তাঁর অনুগ্রহকে চাক্ষুস করে আমার অন্তর আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েছে এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে চোখের পানি বের হয়ে এসেছে।

(তাযকেরাহ,পৃ: ৬৮৫-৬৮৬)

প্রিয় বন্ধুগণ! দয়া করে এই সুন্দর ঘটনাটির প্রতি দিকপাত করুন যে, আল্লাহ্‌র একজন বান্দা যখন তাঁর ধর্মের জন্য জল ছাড়া মাছের ন্যায় ছটপট করছিলেন,তখন আল্লাহ্‌ তাঁর সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন এবং তাঁর দোয়া শোনেন এবং সেই সঙ্গে তাঁকে সতর্ক করেন... এটি আল্লাহ্‌র সঙ্গে বান্দার সম্পর্কের একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, যেখানে তাঁর (আ.) ইসলাম প্রচারের আবেগ ও আল্লাহ্‌ তা'লার প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশের একটি সুন্দর পাঠ দৃশ্যায়িত হয়।

আল হামদোলিল্লাহ, প্রতিশ্রুতি মসীহ (আ.)-এর লেখনী হতে অদ্যবধি লক্ষ লক্ষ পবিত্র আত্মা উপকৃত হয়েছে এবং মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষেরা আহমদীয়া জামাতে যোগদান করেছে। উক্ত পুস্তকাবলীর কল্যাণ কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে এবং তৃষ্ণার্ত আত্মারা এই জীবনদায়ক পানীয় থেকে নিজেদের তৃষ্ণা নিবারণ করবেন। ইনশাআল্লাহ।

এই ঘটনা থেকে হযরত মসীহ

যুগ ইমামের বাণী

অতএব, কুরআন শরীফ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী হিদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া প্রধান ও আবশ্যক বিষয়।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum, From Lutful Haque Sb., Kandi (MSD)

মওউদ (আ.)-এর উচ্চাশার অনুমান করা যায়। জনাব আহসান আমরোহী সাহেব হযরত মুফতি মুহাম্মদ সদিক সাহেবের বরাতে বর্ণনা করেন,

হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদিক সাহেব (রা.)বর্ণনা করেন, একবার কেউ খুব জোরে হুযুরের ঘরের দরজায় টোকা দেয়, হুযুর (আ.) ব্যস্ত থাকার কারণে মুফতি সাদিক সাহেবকে যিনি তখন তাঁর কাছেই রেখেছিলেন,তাঁকে তিনি বললেন, বাইরে দেখ। মুফতি সাহেব বাইরে যান এবং ফিরে এসে বলেন, মৌলবী মুহাম্মদ আহসান আমরোহী সাহেব বলতে এসেছেন যে, অমুক শহরে এক অ-আহমদী মৌলবীর সঙ্গে তার বাহাস হয়েছে এবং তিনি তাকে তিনি পরাজিত করেছেন। হুযুর (আ.) বলেন, এভাবে তাঁর জোরে দরজায় কড়া নাড়া শুনে আমি মনে করেছিলাম, সম্ভবত তিনি এই খবর নিয়ে এসেছেন যে, ইউরোপ মুসলমান হয়ে গেছে। (সীরাতুল মাহদী)

সুধী শ্রোতামন্ডলী! হযরত মসীহ মওদউ আ.) এর কলমের জেহাদ ও ইসলামের প্রতিরক্ষা কেবল তাঁর জামাতের মানুষকে আধ্যাত্মিক জীবনই দেয় নি বরং অন্যদের মধ্যেও ইসলামের একটি নতুন চেতনা জাগিয়ে তুলেছে। আল্লাহ্‌র এই প্রেমিক, মুহাম্মদ (সা.)এর ব্যকুলতাকে নিজের মধ্যে লালনকারী সত্তা.... যখন এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন.... তখন বিরোধীরাও দুঃখ প্রকাশ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে শুধু স্বীকাররোক্তি পেশ করছি,মাওলানা আবুল কালাম আজাদ আখবার ওয়াকিল অমৃতসরের।

"তিনি এক অতি মহান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর লেখনী ও কথার মধ্যে যাদু ছিল। তাঁর মস্তিষ্ক মূর্তিমান বিস্ময় ছিল। তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রলয় স্বরূপ এবং কণ্ঠস্বর কেয়ামত সদৃশ। তাঁর অঙ্গুলি সংকেতে বিপ্লব উপস্থিত হত। তাঁর মুষ্টিদ্বয় ছিল বিদ্যুতের ব্যাটারীর ন্যায়। তিনি ত্রিশ বছর যাবৎ ধর্ম জগতে ভূমিকম্প ও তুফানের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। তিনি প্রলয় বিষাণ হয়ে ঘুমন্তদের জাগ্রত করতেন।... তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানীর মৃত্যুর ঘটনা অব্যশই শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য। এরূপ মহাপুরুষগণ, যাদের দ্বারা ধর্ম ও জ্ঞান-বুদ্ধির জগতে বিপ্লব সাধিত হয় তাঁরা বার বার পৃথিবীতে আসেন না।ইতিহাসের এই সকল গৌরবান্বিত মহাপুরুষের জগতের দৃশ্যপটে আবির্ভাব খুবই বিরল হয়ে থাকে এবং যখন তাঁরা আসেন তখন জগতে বিপ্লব সাধন করে যান। মির্যা সাহেব অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। ... তাঁর সঙ্গে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় তিনি বিজয়ী জেনারেলের কর্তব্য সম্পাদন করেছেন -তাঁর এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আমাদের উক্ত অনুভূতি প্রকাশ্যে স্বীকার করতে বাধ্য করেছে। খ্রিষ্টান ও আর্য সমাজীদের বিরুদ্ধে মির্যা সাহেব যে সাহিত্য রচনা করেছেন তা সর্বসাধারণ্যে সমাদার লাভ করেছে এবং এই বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি কোন পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নন। ধর্মীয় জগতে ভবিষ্যতে এরূপ শান ও মর্যাদা সম্পন্ন মহাপুরুষ জন্মলাভ করবেন বলে আশা করা যায় না।" (তারিখে আহমদীয়াত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৬০)

শ্রোতাবৃন্দ! আল্লাহ্‌ মনোনীত বান্দারা স্বর্গীয় রাজ্যের প্রতিনিধি হয়ে থাকেন এবং পার্থিব রাজত্বের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকে না। তাঁরা শুধু এটাই চান যে, এই অস্থায়ী জগতের শাসক ও রাজারা নশ্বর বিশ্বের সম্মান ও গরিমার পরিবর্তে প্রকৃত স্রষ্টা ও মালিকের সান্নিধ্যে স্থান পান। এ কারণে তাঁরা এই পার্থিব বাদশাহদের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছে দিয়ে দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"পার্থিব বাদশাহদের রাজত্ব তাদের জন্য শুভ হোক। আমরা তাদের রাজত্ব ও সম্পদে আগ্রহী নই, স্বর্গরাজ্যই আমাদের জন্য যথেষ্ট, হ্যাঁ, সৎ উদ্দেশ্য ও সত্যিকারের সদিচ্ছা নিয়ে বাদশাহদের ঐশী বার্তা পৌঁছে দেওয়া আবশ্যক।"

(তোহফায়ে কায়সারিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১২, পৃ: ২৬৫)

মুঝকো ক্যা মুলকোঁ সে মেরা মুলুক হ্যা সব সে জুদা/ মুঝকো ক্যা তাজোঁ সে মেরা তাজ হ্যা রিজওয়ানে ইয়ার।

হামতো বসতে হ্যাঁ ফালক পর ইস জমীঁ কো ক্যা কারেঁ/ আসমাঁ কে রেহনে ওয়ালোঁ কো জমীন সে কি নিকার?

(আমি রাজত্ব নিয়ে কী করব আমার সম্পদ তো ভিন্ন/ আমি রাজমুকুট নিয়ে কী করব? আমার রাজমুকুট তো হল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি।

আমি তো ঐশী লোকে বাস করি এই পৃথিবী নিয়ে আমাদের কাজ কি/ ঐশীলোকে বসবাসকারীদের পৃথিবীর কী পরোয়া?

এখন আমি আমার বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশের দিকে আসছি। আর তা হল, হুযুর আনোয়ারের উপদেশ এবং আহমদীয়া জামাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন-

তবলীগ কোন সহজ কাজ নয়, বরং খুবই কঠিন কাজ। একটি অট্টালিকা প্রস্তুত করা সহজ কাজ কিন্তু একজন মানুষের অন্তর পরিবর্তন করা সহজ নয়। কেননা সঠিক পরিকল্পনা ও যুক্তি ব্যতীত মানুষের অন্তর পরিবর্তন করা যায় না।

(খুতবাতে মাহমুদ, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১২৫)

"তরবারির তলায় থেকেও আমাদের পূর্বের লোকেরা তবলীগের কাজে শিথিলতা দেখায় নি। হযরত উমরের আমলে যখন মুসলমানদের এমন অবস্থা ছিল যে, তারা চতুর্দিক থেকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, খ্রিষ্টানরা কনস্টান্টিনোপলে শাসন করছিল এবং অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে তাদের রাজত্ব ছিল। আর অন্যদিকে ইরানে যে সরকার ছিল তারাও প্রভাব ছিল অর্ধেক বিশ্ব জুড়ে। সেই সময় চতুর্দিক হতে মুসলমানদের উপর আক্রমণ হচ্ছিল, কিন্তু মুসলমানরা তরবারির ভয়ে ভীত হয় নি, তাহলে আজ আমরা কি শত্রুর ভাষা ও অর্থকে ভয় পেতে পারি? সুতরাং আমাদের এর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত এবং প্রয়োজনে সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।" (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-৮, পৃ:৪৭-৪৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) বলেন,সাহস কর এবং এগিয়ে চল। আর পৃথিবীর প্রান্তে পৌঁছে আল্লাহ্‌র নাম ছড়িয়ে দাও। এই পথে তোমাদের যে প্রকার কুরবানী করতে হয়, তাতে উদ্বিগ্ন হয়ো না এবং ভয় পেয়ো না। এ পথে যদি তোমাকে প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুকে কুরবান করতে হয়, করো। আর একটাই লক্ষ্য নিয়ে দণ্ডায়মান হও। জ্ঞানের ভান্ডার পৃথিবীতে পৌঁছে দাও যার সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, মসীহ মওউদ ধনসম্পদ বন্টন করবেন। কিন্তু লোকেরা তা গ্রহণ করবে না। মসীহ মওউদ (আ.) তোমাদেরকে কুরআন করীমের সম্পদ প্রদান করেছেন। তাকে তোমরা সমগ্র বিশ্বে প্রচার ও প্রসার কর।

(খুতবাতে মাহমুদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) আল্লাহ্‌র বার্তা প্রেরণ সম্পর্কে এক উপদেশ প্রদান করে বলেন-

"আমার প্রভু আমার হৃদয়ে তবলীগের যে শিখা জাগ্রত করেছেন এবং আজ হাজার হাজার আহমদীর হৃদয়ে সেই শিখা জ্বলছে, তাকে নিষ্প্রভ হতে দিও না। এই পবিত্র আমানতকে রক্ষা করবে। আমি প্রতাপান্বিত খোদার নামে শপথ করে বলছি, যদি তুমি এই শিখার রক্ষাকারী হও তাহলে খোদা তা কখনোই নিষ্প্রভ করবেন না, এই শিখা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং এক বক্ষ হতে অন্য বক্ষে আলোকিত হতে থাকবে এবং সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে বেষ্টন করবে আর সমস্ত অন্ধকারকে আলোতে পরিণত করবে।"

(খুতবাতে তাহের, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২২)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) জামাতের বন্ধুদের উপদেশ দিয়ে বলেন-

"হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের যে যুক্তি-প্রমাণ,জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক সম্পদ প্রদান করেছেন, তাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের তবলীগি প্রচেষ্টাকে আরও সক্রিয় করতে হবে।এর জন্য ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। তাকওয়ায় অগ্রগতি অপরিহার্য। কারণ আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি না হলে আমাদের তবলীগ কল্যাণময় হবে না।... সুতরাং , একজন আল্লাহ্‌র বার্তা প্রেরণকারীর জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র বার্তা প্রেরণকারীদের মনে রাখলে চলবে না, বরং প্রতিটি আহমদীর উচিত সক্রিয় হয়ে তবলীগ করছে কি না? পৃথিবীবাসী যদি জানে অমুক ব্যক্তি একজন আহমদী, যদি সমাজের মানুষ জানে যে, অমুক ব্যক্তি একজন আহমদী,তবে সেই আহমদীকে মনে রাখতে হবে যে, আহমদী শব্দটি তার সাথে যুক্ত, সে তবলীগ না করলেও তার আহমদী হওয়া তাকে নীরবে আল্লাহ্‌র বার্তা প্রেরণকারী করে তোলে।

প্রত্যেক আহমদী যে নিজেকে আহমদী বলে দাবি করে এবং নিজেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতি সম্বন্ধিত করে তার কর্তব্য যে, সে আমল একারণে সঠিক রাখবে কেননা, তাকে সকলে দেখছে। যদি তার বিশেষ ধর্মীয় জ্ঞান নাও থাকে যা তাকে সক্রিয় প্রচারক করে তুলতে পারে, তথাপি তার প্রত্যেক কথা-কর্ম অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। যদি নেক কর্মকাণ্ড হয়, তাহলে মানুষ ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ হবে এবং কাছাকাছি আসবে। হৃদয় আকৃষ্ট করা আল্লাহর কাজ আর তবলীগ করা নবীদের সাথে ঐশী জামাতীয় সদস্যদের কাজ।"

(খুতবা জুমআ, ৯ই এপ্রিল, ২০১০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন,

"হেদায়াত প্রচারের কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব এখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এ র উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সেই হেদায়াত যা আঁ হযরত (সা.) সমগ্র মানবজাতির জন্য নিয়ে এসেছিলেন এবং যা ছড়িয়ে দিতে তিনি (সা.) সর্বদা ব্যকুল ছিলেন তা পূর্ণতা পাবে এই যুগে যখন সমস্ত উপায় উপলবন্ধ।এই কাজটি যেমন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উপর অর্পণ করা হয়েছিল, তেমনি এখন এই কাজটি তাঁর অনুসারীদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে এবং তাদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে যারা অঙ্গীকার করে যে, আমরা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিব। " (খুতবা জুমআ, ১১ই নভেম্বর, ২০১৬)

এই প্রসঙ্গটি কোন পুরানো আখ্যান নয়, বরং এটি এমনই এক অবিরাম প্রবাহমান নদীর ন্যায় যার কোন কুল কিনারা দেখতে পাওয়া যায় না এবং আল হামদোলিল্লাহ আমরা সেই সৌভাগ্যবান জামা'ত যারা

এরপর ৭ পাতায়....

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

জামা'ত আহমদীয়া ও মানব সেবা

তানভীর আহমদ খাদিম সাহেব

-অনুবাদক: জাহিরুল হাসান, ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ-
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-
إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ اٰمَنُوا فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ প্রদান করবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবে।

তোমাদর কিভাবে বলব যে আমি কি চাই, নগণ্য অধম বান্দা আমি খোদাকে পেতে চাই। কারও প্রতি আমার কোনও বৈরিতা নেই, বিশ্বের সবার আমি কল্যাণ কামনা করি।

শ্রদ্ধেয় সভাপতি ও সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু হল-" জামাত আহমদীয়া এবং মানব সেবা।"

সম্মানীয় শ্রোতামণ্ডলী! ধর্মের দুটি অংশ রয়েছে, একটি হল আল্লাহ্‌র প্রতি ন্যায় বিচার করা, অর্থাৎ তাঁর ইবাদত করা এবং অন্যটি হল তাঁর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি করা এবং সেবা করা।

আজকে আমি খোদার সৃষ্টির সেবা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করব যে,এই ব্যপারে ইসলামের শিক্ষা কি এবং জামাত আহমদীয়া এ বিষয়ে কি ভূমিকা পালন করছে।

শ্রোতামণ্ডলী! খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বৈধ বিষয়ে ধর্ম, বর্ণ ও জাতি ভেদাভেদ না করে খোদার সৃষ্টিকে সেবা, সাহায্য ও সহানুভূতি করাকে 'খিদমতে খালক' বা সৃষ্টির সেবা বলে।

সৃষ্টির সেবা হল ঐশী ভালবাসার প্রয়োজন, ঈমানের চেতনা এবং ইহকাল ও পরকালের জন্য সফলতার একটি মাধ্যম। শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তই সৃষ্টির সেবা নয়, কাউকে লাভদায়ক পরামর্শ দেওয়া,কাউকে দক্ষতা শেখানো, বুদ্ধিবৃত্তি দান করা, শিক্ষা ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, কারো দুঃখ-কষ্টে অংশীদারিত্ব করা এবং অন্যান্য অনুরূপ বিষয়গুলি হল মানব সেবার বিভিন্ন উপায়।

ইসলামে, মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সেবা এবং তাদের দুঃখ কষ্টকে লাঘব করা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়, তাই পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী (সা.) এর হাদিসে মানবতার সেবাকে সর্বোত্তম নৈতিকতা এবং মহান ইবাদত হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদেরকে মানুষের সেবা করার উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন-

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ
الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى
حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ
وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِي الرِّقَابِ ۚ

অনুবাদঃ এটি পুণ্যকর্ম নয় যে, তোমরা পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে নিজেদের মুখ ফেরাও, বরং প্রকৃত পুণ্যবান ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্ এবং পরকাল এবং ফিরিশতাগণ এবং কিতাবসমূহ এবং নবীগণের উপর ঈমান আনে; এবং সে তাঁরই প্রেমে আত্মীয়স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্যকারী এবং বন্দী মুক্তির জন্য ধন-সম্পদ খরচ করে।

(সুরা বাকারা: ১৭৮)

কুরআন করীমের অপর এক স্থানে এই বিষয়ে নির্দেশনা আছে-

وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

অনুবাদ: তোমরা পুণ্যকাজে এবং তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমা লঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না।

ইসলাম তার অনুসারীদের এই শিক্ষা দেয় যে তারা যেন পুণ্য ও কল্যাণমূলক কাজে একে অপরকে সাহায্য করে, এবং পাপ ও অপরাধমূলক কাজে কাউকে সাহায্য না করে,বরং পাপ ও অশ্লীলতা থেকে যেন বিরত থাকে। এটাও মানব সেবার অংশ।

একটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন- خير الناس من ينفع الناس

অনুবাদ: মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম হল সেই ব্যক্তি যে অন্যদের উপকার ও কল্যাণ সাধন করে। (তিরমিযি)

অপর এক স্থানে তিনি (সা.) বলেছেন,যদি কেউ রাস্তা থেকে কোন কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয় তবে সেটিও সদকা। (সহীহ মুসলিম)

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)এর শিক্ষা আমাদের শিখিয়েছে যে আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হল সেই যে উত্তম আচরণ করে এবং অন্যের সাথে ভাল আচরণ করে। এবং তার নিজের থেকে মানুষের উপকার করা উচিত,এবং কাউকে আঘাত করা উচিত নয়। দরিদ্র, অভাবী এবং সাধারণ মানুষকে সাহায্য করা উচিত,তাদের জীবনের দুঃখ ও শোকের মুহূর্তগুলি থেকে তাদেরকে বের করে আনার চেষ্টা করা উচিত, সে যেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ দিয়ে তাদের কষ্ট ও দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করে, সাহায্যের প্রয়োজন হলে তাদের সাহায্য করে,আর কিছু না পারলে অন্তত তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে,তাদের সাথে মিষ্টি কথা বলে এবং তাদের চিন্তা দূর করে। খাজা মীর দরদ কি সুন্দর বলেছেন-

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে হৃদয়ের ব্যাথার জন্য, নয়তো আনুগত্যের জন্য ফেরেশতা কিছু কম ছিল না।

তাই কুরআন করীমের আয়াত ও মহানবী (সা.)-এর হাদীসের আলোকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে,ইসলাম আমাদের মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টি প্রতি সেবা,সহানুভূতি ও সহযোগিতার শিক্ষা দেয়। এটি বিধবা, শ্রমিক, অনাথ, দরিদ্র এবং নিঃস্বদের প্রতি সহমর্মিতা এবং সহানুভূতি প্রদর্শনকে উৎসাহিত করে।

আর আমাদের সকলের উচিত ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে যেভাবেই সম্ভব আল্লাহর সৃষ্টদের সেবা ও সহযোগিতা করা, কেননা হাদীস শরীফে আল্লাহর সৃষ্টিকে আল্লাহর পরিবার বলা হয়েছে এবং তাদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতিই খোদায়ী ভালবাসা অর্জনের মাধ্যম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনটি মহানবী (সা.) বলেছেন-

الخلق عيال الله فاحبّ الخلق الى الله من احسن الى عياله

অনুবাদ: সমস্ত সৃষ্টিই খোদা তা'লার পরিবার এবং খোদার কাছে সৃষ্টির সবচেয়ে প্রিয় ও স্নেহাস্পদ সেই ব্যক্তি যে খোদার বান্দাদের সাথে সদয় আচরণ করে।

একবার মহানবী (সা.)বলেন-

والذى نفسى بيده لا يومن عبد حتى يحب لاخيه
مايحب لنفسه.(سنن ترمذى، كتاب السير)

অনুবাদ: সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন, কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেই (কল্যাণ) না চায় যা সে নিজের জন্য কামনা করে।"

উল্লিখিত রেওয়ায়েতগুলো থেকে যেখানে জনগণের সেবার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলাম ধর্ম মানুষের সেবার পরিধিকে একক ব্যক্তি বা কিছু লোকের পরিবর্তে সমগ্র মানবতার জন্যভাগ করেছে। দরিদ্র হোক বা ধনী, রাজা হোক বা সাধারণ প্রজা প্রত্যেক মানুষই তার সামর্থ্য অনুযায়ী সেবা করার প্রতি দায়িত্বশীল।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্‌র নবী (সা.) নিছক মৌখিভাবে মানুষের সেবা করার শিক্ষা দেন নি, বরং তাঁর ব্যবহারিক জীবন ছিল মানুষের সেবায় পরিপূর্ণ।

মানব সেবার গুরুত্ব এ থেকেও অনুমান করা যায় যে, তিনি যখন প্রথম ওহী লাভের পর গৃহে আসেন,তখন শোকাহত সহধর্মিণী উম্মুল মোমেনীন হযরত খাদিজা (রা.)এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মানব সেবার ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর উত্তম নৈতিকতার সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেন-

فَوَاللّٰهِ لَا يُخْزِيكَ اللّٰهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ
وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

"আল্লাহ্ কসম, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আপনাকে কখনই নষ্ট করবেন না। আপনি আপনার আত্মীয়দের হক আদায় করেন,গরীবদের বোঝা বহন করেন, পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয় নৈতিকতা ও গুণাবলী প্রতিষ্ঠা করেন, আতিথেয়তা দেখান এবং প্রকৃত দুঃখে সাহায্য করেন।"

অতঃপর তাঁর পবিত্র জীবনী অধ্যায়ন করলে দেখা যায় যে, নবুওতের পূর্বেও তিনি মানুষের সেবার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, নবুওত লাভের পর মানব সেবার মনোভাব আরও বেড়ে যায়। গরীবদের সাহায্য করা,তাদের প্রতি করুনা করা, অসহায়, নিঃস্ব,দুর্বল ও আর্তদের সেবা করা তাঁর অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোই তাঁকে আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টির সাথে যুক্ত করেছিল। 'হিলফুল ফুজুল'-এর অংশগ্রহণ করা, একজন অমুসলিম বৃদ্ধার বোঝা বহন করে হাঁটা, মক্কা বিজয় উপলক্ষ্যে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা এবং মদিনার কৃতদাসীদের তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর সাহাবীরাও সেবার চেতনায় নিবেদিত ছিলেন।

শ্রোতামন্ডলী! হযরত রসুলে করীম (সা.) এর নিষ্ঠাবান সেবক, এ যুগের মসীহ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও তাঁর প্রভু হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

অনুসরনে মানব সেবাকে তাঁর বিশেষত্ব বলে ঘোষণা করেছিলেন।

বয়আতের অঙ্গীকারের চতুর্থ শর্তে হুযুর (আ.) বলেছেন–

"প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে আর বিশেষ করে কোন মুসলমানকে কথায় বা কাজে বা অন্য কোনও ভাবে কোনও প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবে না।" আবার নবম শর্ত হল, " কেবল আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের সেবায় রত থাকবে এবং খোদা প্রদত্ত নিজ শক্তি ও সম্পদ ব্যয়ে মানব জাতির যথাসাধ্য হিতসাধন করবে।"

(ইশতেহার তাকমীলে তাবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯)

তিনি (আ.) বলেন, "ধর্মের দুটি নিঁখুত অংশ রয়েছে,একটি হল খোদাকে ভালবাসা এবং অন্যটি হল একজন মানুষকে এতটাই ভালবাসা যে কেউ তাদের কষ্টকে নিজের বলে মনে করে এবং তাদের জন্য দোয়া করে।"

(নাসীতে দাওয়াত,রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃ: ৪৬৪)

তিনি (আ.) বলেন, "সেই ধর্ম, ধর্মই নয় যেখানে সহানুভূতির শিক্ষা নেই। আর না সেই মানুষ প্রকৃত মানুষ যার মধ্যে সহানুভূতির কোন প্রকার সত্তা নেই। আমাদের খোদা কোন জাতির মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেন নি।"

(রুহানী খাযায়েন,২৩তম খণ্ড,পৃ: ৪৩৯)

তিনি (আ.) বলেন–

"জীবের প্রতি সহানুভূতি এমন একটি জিনিস যে মানুষ তা ত্যাগ করলে এবং তা থেকে দূরে সরে গেলে ধীরে ধীরে আবার পশুতে পরিণত হয়। এটিই মানুষের মানবতার দাবি এবং সে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ থাকে যতক্ষণ সে তার অপর ভাইয়ের সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করে এবং সহানুভূতি দেখায়। মনে রেখো, আমার কাছে করুণার বৃত্ত অনেক বিস্তৃত। হোক সে হিন্দু বা মুসলিম বা অন্য যে কেউ। আমি কখনই এমন লোকদের কথা পছন্দ করি না যারা সহানুভূতিকে কেবল নিজের লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৪)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর মানব সেবার অগণিত ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সময়ের কথা ভেবে শুধুমাত্র একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করব।

অসুস্থ ও অভাবীদের জন্য একজন পরিশ্রমী সেবক

হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব লিখেছেন যে,কখনো কখনো গরীব অশিক্ষিত মহিলারা ওষুধ আনতে এসে জোরে জোরে দরজায় কড়া নাড়া দিত। এবং তারা তাদের সহজ সরল ভাষায় বলত যে, মির্যা জি দরজা খোলো। হুযুর (আ.)সাথে সাথে এমনভাবে উঠে দাঁড়াতেন মনে হতো যেন কোন প্রভাবশালী বাদশার নির্দেশ এসেছে, অর্থাৎ একজন মহান শাসক বাইরে দাঁড়িয়ে আর তিনি তাঁর আনুগত্য করছেন মাত্র। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দরজা খুলে প্রশস্ত চিত্তে হাসিমুখে কথা বলতেন এবং ওষুধ দিতেন। মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব লেখেন,আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছেও সময়ের মূল্য নেই, তখন অশিক্ষিত লোক যারা তারা তো সময় আরো অপচয় করে থাকে। এখনও পর্যন্ত এই অবস্থাই চলছে। একজন মহিলা আজেবাজে কথা বলতে শুরু করে এবং তার শ্বশুরবাড়ি ও শাশুড়ি ননদের বিরুদ্ধে সে বিষোদগার করা শুরু করে দেয়। এতে এক ঘন্টা সময় নষ্ট হয়েছে। এসেছিল ওষুধ নিতে আর গালগল্প শুরু করে দিল, ওদিকে তিনি (আ.) শান্ত বসে আছেন আর মন দিয়ে ধৈর্য সহকারে তাদের কথা শুনছেন। কথায় কিম্বা ইঙ্গিতেও তাকে বলছেন না যে 'এখন যাও, ওষুধের বিষয়ে জেনে নিয়েছ, এখন আর বসে থাকা কেন? অযথা আমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে।' সে নিজেই ঘাবড়ে উঠে দাঁড়াতো আর নিজের বাতাস দিয়ে ঘর পবিত্র করত।(অর্থাৎ নিজের ভুল বুঝতে পেরে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যেত।)

শত্রুদের প্রতি উত্তম আচরণ

শ্রোতামন্ডলী! আপনজন ও অন্যদের প্রতি সহানুভূতি একটি মহান গুণ, কিন্তু শত্রুদের প্রতি সদয় হওয়া অনেক বেশি মহৎ গুণ। কারণ সকল মানুষই আপনজনদের সেবা ও সহানুভূতি করে এবং অনেক লোক অন্যদেরও প্রতিও সহানুভূতি দেখায়, কিন্তু শত্রুদের প্রতি সহানভূতি দেখানো এবং সেবা করা নবী ও খলীফাদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সম্পর্কে বলেছেন–

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

অনুবাদ: ভাল মন্দের সমান বা মন্দ ভালর সমান হতে পারে না। মন্দকে এমন জিনিসের মাধ্যমে দূরীভূত কর যা উত্তম, তাহলে এমন একজন ব্যক্তি যার সাথে তোমার শত্রুরা ছিল হঠাৎ করে তোমার প্রিয় বন্ধু হয়ে যাবে।

ইসলামের এই শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে যখন মহানবী (সা.) এর মূল্যায়ন করা হয়, তখন তা অতুলনীয়। এই শিক্ষার আলোকে, মহানবী (সা.) তাঁর শত্রুদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করেছিলেন। শত্রুরা সর্বপ্রথম যন্ত্রণা দিয়েছিল,তারপরও যখন মক্কা বিজয় হয়েছিল এবং সমস্ত বিরোধিরা তাঁর নিয়ন্ত্রনে এসেছিল, তখন তিনি তাঁর প্রাণের শত্রুদের لاتثريب عليكم اليوم বলে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এই ঘটনাটি কিয়ামত পর্যন্ত এই সত্যের সাক্ষ্য দিতে থাকবে যে, মহানবী (সা.) পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়ে বেশি দয়ালু এবং তিনি মানবতার জন্য করুণার পরাকাষ্ঠা এবং পরম মমতাময়।

এই যুগেও হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)–এর অনুসরণে তাঁর শত্রুদের প্রতি সহানুভূতির এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন।

তিনি (আ.) বলেন, "তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়া করুন এবং তাদের জিহ্বা বা হাত দিয়ে বা কোন পরিকল্পনা দ্বারা অত্যাচার করবেন না এবং সৃষ্টির কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। আর কারো প্রতি অহংকার করো না যদিও সে তোমার অধীনস্ত হয়। আর কাউকে গালি দিওনা যদিও সে তোমাকে গালি দেয়। বড় হয়ে ছোটদের প্রতি করুণা কর,তাদের তুচ্ছ করো না। এবং একজন আলেম হয়ে জ্ঞানীদের উপদেশ দাও আত্ম –অহংকার দেখিয়ে তাদের অপমান করো না।এবং ধনী হয়ে গরীবদের সেবা কর, তাদের নিয়ে অহংকার করো না। মৃত্যুর পথকে ভয় কর।"

(কিশতিয়ে নূহ,রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃ:১১–১২)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর এই অসাধারণ সেবার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

কাদিয়ানের একজন, নিহাল চাঁদ (নিহালা) একজন ব্রাহ্মণ ছিল, যে যৌবনে একজন বিখ্যাত মামলাকারী ছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে এসব করে বেড়াত। সে ছিল সেই সব লোকদের একজন যারা সাধারণত হযরত আকদাসের পরিবারের সাথে বিবাদ ও ফাসাদ করত, তারপর জামাতের শত্রুদের সাথেও সে ওঠাবসা করত। শেষ বছরগুলোতে তার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়। এমনকি কখনও কখনও সে তার দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় সে একবার হযরত মসীহ মওউদ(আ.)–এর দরজায় উপস্থিত হয়ে সাক্ষাতের অনুরোধ জানায় এংবং হযরত সাহেবকে খবর দেয়। হুযুর তৎক্ষণাৎ বাইরে আসেন। সে সালাম দিয়ে তার গল্প বলতে শুরু করে। হযরত আকদাস তাকে শুধু সান্ত্বনা দিলেন না, পঁচিশ টাকা এনে দিলেন এবং বললেন, আপাতত, এই টাকা নিয়ে কাজ চালাও এবং প্রয়োজনে আমাকে জানাবে। এরপর থেকে সে প্রত্যেক মাসে আসত এবং প্রয়োজনের জন্য হুযুরের নিকট থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়ে যেত।

(সীরাত হযরত মসীহ মওউদ , পৃ:২৯৯)

শ্রোতামন্ডলী! এরকম আরও একটি ছোট গল্প শুনুন।

"যে দিনগুলোতে পাঞ্জাবে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে অগণিত মানুষ মারা যাচ্ছিল, তখন তাঁর (আ.) করুণার আবেগের কারণে কি অবস্থা ছিল এ ব্যাপারে হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোটি (রা.) বলেন যে তিনি নিভৃতে হুযুরকে দোয়া করতে শুনেছেন আর এ দৃশ্য দেখে তিনি আশ্চর্যচকিত হয়ে যান। তিনি বলেন, " এই দোয়ায় তাঁর কণ্ঠে এত বেদনা ও প্রদাহ ছিল যে শ্রবণকারীর পিত্ত পানি হয়ে যেত। আর তিনি (আ.) ঐশী আস্তানায় এভাবে কান্নাকাটি করতেন যেভাবে প্রসব বেদনায় কোন মহিলা আর্তনাদ করে। আমি মনোযোগ সহকারে শুনলাম যে তিনি মহামারির আযাব থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে কাতর দোয়া করছিলেন, যে হে আল্লাহ্! এই মানুষগুলো যদি মহামারিতে মারা যায়, তাহলে তোমার ইবাদত কে করবে?"

[সীরাতে তৈয়্যবা, পৃ: ৫৪, সীরাত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম, শামাইল ও আখলাক, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৫, লেখক–শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি (রা.)]

তিনি জামাতকে উপদেশ দান করে বলেন–

কটুক্তি শোনার পরে,দোয়া করুন এবং ব্যাথা পেয়ে আরামের ব্যবস্থা করে দিন।

অহংকারের অভ্যাস দেখলে, আপনি আপনার নমনীয়তা তুলে ধরুন।

তাই আজ, জামাতে আহমদীয়া হযরত মসীহ মওউদ(আ.) এবং যুগ খলীফাগণের নির্দেশনার আলোকে মানব সেবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করাকে একটি কর্তব্য মনে করে এবং এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করে।

চিকিৎসার মাধ্যমে সেবা করা

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এবং যুগ খলিফাদের পক্ষ থেকে চিকিৎসা ও দোয়া সহ করুণাময় সেবার ধারা সর্বদা অব্যাহত রয়েছে। নূর হাসপাতাল কাদিয়ান, ফজলে উমর হাসপাতাল রাবওয়া, নুসরাত জাহান স্কীমের অন্তর্গত আফ্রিকার ৩৯টি হাসপাতাল দ্বারা মানবজাতির জন্য সেবা প্রদান। একইভাবে, বিনামূল্যে পরীক্ষা ও ওষুধ সরবরাহের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী দাতব্য মেডিক্যাল ক্যাম্পের অধীনে লক্ষ লক্ষ রোগীকে পরিষেবা প্রদান করা হয়।

তাহির হোমিওপ্যাথিক রিসার্চ ইনস্টিউট হাসপাতালে সেবার পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে শত শত বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারিতে

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

এবং যখন ভাগ-বন্টনের সময় নিকটাত্মীয়, এতীম এবং মিসকীনগণ উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগকেও উহা হইতে দিও এবং তাহাদের সহিত ন্যায়-সঙ্গত কথা বলিও। (আন-নিসা: ৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun, From Mirza Enayetulla Sb Harhari, Murshidabad

জামাত কর্তৃক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। রাবওয়াতে একটি স্থায়ী ব্লাড ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা এবং বিশ্বব্যপী আহমদীদের রক্তদানের বিশাল ধারা অব্যাহত রাখা।

শিক্ষাঙ্গনে সেবা প্রদান

শিক্ষাঙ্গনেও সেবার বিষয়ে জামাত আহমদীয়া সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসেছ। নাযারাত তালিম, ওকালত তালিম, এবং অঙ্গ সংগঠনগুলিতে শিক্ষা ও ছাত্র বিষয়ক বিভাগের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। নুসরাত জাহান এগিয়ে চলো স্কিমের আওতায় আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে শতাধিক স্কুলের মাধ্যমে লক্ষাধিক শিক্ষার্থীকে শিক্ষার সুবিধা প্রদান। উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি ও পদকের ব্যবস্থা। ফ্রি কোচিং ক্লাস,ক্যারিয়ার প্ল্যানিং সেমিনার,বুক উইং-এর মাধ্যমে অভাবী শিক্ষার্থীদের বই সরবরাহ, এমটিএ-র মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষা শেখানোর প্রচেষ্টা, বিনামূল্যে কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা, অবকাশকালীন শিক্ষার সুবিধা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে সেবা প্রদান।

অনাথ ও বিধবাদের পৃষ্ঠপোষকতা

দার উল যুআফা,দারুল শায়ুখ এবং দারুল ইকামা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এতিম ও বিধবদের জন্য সহায়তা পরিষেবা, বিধবাদের আর্থিক সহায়তার জন্য স্থায়ী উপবৃত্তি প্রদান,বায়তুল-হামদ প্রকল্পের অধীনে দরিদ্রদের জন্য আবাসন প্রদান এবং শহীদ ও বন্দী পরিবারের জন্য সৈয়্যদানা বিলাল তহবীল প্রতিষ্ঠাও অনন্য ভূমিকা পালন করে।

শ্রোতামন্ডলী! জামাত আহমদীয়া সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষকে সাহায্য করার জন্য সর্বদা পরিশ্রমী ও উদ্যেগী। এটি সর্বদা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন যুদ্ধ,দুর্ভিক্ষ,ভূমিকম্প, সুনামি,বন্যা ইত্যাদির কবলে পড়া দুর্গতের সহানুভূতিশীল সেবায় সর্বদা উপস্থিত থাকে।

নিপীড়িত জাতিদের সাহায্য

দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফ্রিকার নিপীড়িত মানুষের জন্য অসাধারণ সেবার ব্যবস্থাপনা

বলকান রাজ্য,বসনিয়া ও আলবেনিয়ার যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জনগণকে আর্থিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদান এবং নিখোঁজ প্রিয়জনদের সন্ধানের জন্য আহমদীয়া টেলিভিশনে একটি বিশেষ প্রচারণা চালু করা হয়েছিল।

আরব বিশ্বের অধিকারের জন্য সফল কুটনৈতিক প্রচেষ্টা, বিশেষ করে ফিলিস্তিন, জর্ডান, মরোক্কো, লেবানন এবং লিবিয়ার স্বাধীনতার জন্য, এছাড়া বিশ্বের যে কোন অঞ্চলে নিপীড়িত মানুষের জন্য আইনি সহায়তা, চিকিৎসা, আর্থিক এবং জীবনদায়ী সহায়তা সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক জনমতের মাধ্যমে সচেতনতার ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিটি সম্ভাব্য বাস্তব প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

বিবিধ সেবা:

মানবজাতির সহানুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে জা'মাত আহমদীয়া এমন অনেক অনুরূপ পরিষেবা প্রদান করে থাকে যা অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ,হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর লঙ্গরখানাগুলো সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে স্থায়ীভাবে মেহমানদের খাবার পরিবেশন করে থাকে। রমযান ও ঈদ উপলক্ষ্যে গরীবদের মধ্যে গিফট প্যাকেট বিতরণ ও গ্রীষ্মকালে মুখাপেক্ষীদের মধ্যে গম ও শীতকালে শীতবস্ত্র সরবরাহের স্থায়ী ব্যবস্থা, নিঃস্ব বন্দীদের আইনি ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থাপনা ও দরিদ্রদের বিয়ে উপলক্ষ্যে উপহার, দান সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ ইত্যাদি অসাধারণ অবদানও অন্তর্ভুক্ত।

হিউম্যানিটি ফার্স্ট, মানব সেবার একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা

সম্মানীয় শ্রোতামন্ডলী! মানব সেবাকে একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার অধীনে সুষ্ঠু সম্পাদনের উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ১৯৯৫ সালে হিউম্যানিটি ফার্স্ট -এর সূচনা করেছিলেন। আজ হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর কল্যাণময় যুগে জামাত আহমদীয়া একটি শ্রেষ্ঠ উম্মতরূপে বিশ্বব্যাপী মানবকল্যাণে নিয়োজিত। বিশ্বে আর্ত মানবতার সেবায় জামাত-এর সংগঠন হিউম্যানিটি ফার্স্ট সৌভাগ্য অর্জন করে চলেছে।

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর শাখা বিশ্বের পঞ্চাশটিরও বেশি দেশে প্রতিষ্ঠিত যেখানে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে দাতব্য সেবার মাধ্যমে আর্ত ও অভাবী মানবতার সেবার কাজ অব্যাহত রয়েছে। খুদ্দামুল আহমদীয়াকে সম্বোধন করে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ১৫ই এপ্রিল ১৯৩৮ সালে বলেন-

"মানব সেবার কাজে যতদূর সম্ভব ব্যপকতা সৃষ্টি করতে হবে। ধর্ম ও জাতির সীমাকে দূরে রেখে প্রত্যেক সমস্যা জর্জরিত মানুষের ব্যাথা দূর করতে হবে। সে হিন্দু হোক বা খ্রিষ্টান অথবা শিখ যেই হোক না কেন। আমাদের খোদা হলেন বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। যেভাবে তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন একইভাবে হিন্দু, শিখ ও খৃষ্টানদেরও তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাই খোদা তৌফিক দান করলে আমাদের সকলকে সেবা করা উচিত।

(আল ফজল, ২২ শে এপ্রিল, ১৯৩৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) মানবজাতির প্রতি সহানভূতির বিষয়ে নিজের আকাঙ্খা ব্যক্ত করে বলেন-

"আমার হৃদয়ের বাসনা হল সমগ্র বিশ্বে সহানুভূত প্রদর্শনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সহানুভূতি প্রদর্শনের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত যেন জা'মাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে হয় ... আমার অন্তরে খোদা তা'লা বিষয়টির প্রতি অসীম উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন। আমি চাই আহমদীয়া জা'মাত মানবজাতির মমতায় এমন মহৎ কাজ করুক যা তার ব্যপকতার সাথে প্রসারিত হতে থাকবে যতক্ষণ না জামা'ত আহমদীয়া সমগ্র বিশ্বের সব চেয়ে দয়ালু ও সহানুভূতিশীল জামাতে পরিণত হয়।"

(খুতবাতে তাহের, ২য় খণ্ড, পৃ:৫৭২-৫৭৩)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) জলসা সালানা জার্মানী উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেন-

"সর্বদা মনে রাখবেন যে, জলসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে মসীহ মওউদ (আ.) একদিকে যেমন ইবাদত,তবলীগ তাকওয়া এবং অন্যান্য অনেক উদ্দেশ্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেখানে বিশেষ করে বান্দাদের অধিকার এবং এর মধ্যে মানুষের প্রতি সমবেদনার বিষয়ে অনেক কিছু বলেছেন। তাই প্রকৃতপক্ষে যদি মানুষের মধ্যে সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির স্পৃহা জন্ম নেয়,তাহলে বান্দাদের হকও আপনা আপনি আদায় হয়ে যাবে। সুতরাং প্রত্যেক আহমদীর এ দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখনই জলসার বিষয়ে বিজ্ঞাপন ও ঘোষণা দিয়েছেন, তখনই তিনি এই দিকটি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেছেণ। তিনি যেখানে সর্বশক্তিমান খোদার ভয়, তাকওয়া, সাধনা ইত্যাদির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন,সেখানে তিনি জোরালোভাবে সততা, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব, নম্রতা ও নমনীয়তা প্রদর্শনের দিকেও মনোযোগ দিয়েছেন যে কেবল ইবাদতই তাকওয়া নয়,শুধুমাত্র হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে সম্পর্ক থাকা তাকওয়া নয়, বরং তাকওয়া তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে যখন পিতা-মাতার অধিকারও পূর্ণ হচ্ছে, স্ত্রী-সন্তানের অধিকারও পরিশোধ করা হচ্ছে, যখন স্বামী-সন্তানের অধিকারও পরিশোধ করা হচ্ছে, যখন প্রিয় আত্মীয়দের অধিকারও পরিশোধ করা হচ্ছে, যখন বন্ধুদের অধিকারও পরিশোধ করা হচ্ছে, যখন প্রিয় আত্মীয়দের অধিকারও পরিশোধ করা হচ্ছে, যখন প্রতিবেশীদের হকও আদায় করা হচ্ছে,যখন ভাই-বোনের হকও পরিশোধ করা হচ্ছে,যখন জামা'তের সদস্যদেরও হক আদায় করা হচ্ছে, এমনকি যখন শত্রুদেরও হক আদায় করা হচ্ছে তখনই তাকওয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে।আর এই সমস্ত শিক্ষা পবিত্র কুরআনে রয়েছে।

তিনি (আ.) আরও বলেন-

জামাতে মানুষ ও মানবতার সেবার প্রতি যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং ধনী-গরীব প্রত্যেকেই নিজ নিজ মান অনুযায়ী এ প্রচেষ্টায় রত থাকে যে কবে সে সুযোগ পাবে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সৃষ্টির সেবার কাজ করবে। খেদমতের কাজে প্রত্যেক আহমদীর হৃদয় এত উন্মুক্ত কেন? কেননা ইসলামের যে অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, যদি আল্লাহ্‌র ভালবাসা চাও,তাহলে তাঁর সৃষ্টির প্রতি উত্তম আচরণ করো এবং তাদের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখো। এটিও একটি মহান মাধ্যম যা আপনাকে মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্য দান করবে। এই সুমহান শিক্ষাকে হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর বয়আতের শর্তাবলীর একটি প্রধান শর্ত হিসেবে ঘোষণা করেছেন যে, আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পর একজনের উচিতত স্বীয় সমস্ত ক্ষমতা ও আশিস ব্যবহার করে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি শুধু সহানুভূতিই নয়, তাদের যথাসাধ্য কল্যাণ সাধন করা উচিত।

তাই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের প্রয়োজন হলে আহমদী এগিয়ে। বন্যা দুর্গতের সাহায্যের প্রয়োজন হলে আহমদী এগিয়ে। অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটেছে যে আহমদী যুবকরা পানির প্রবল স্রোতে ভেসে গিয়ে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, কিন্তু ডুবন্তদের তীরে পৌঁছে দিয়েছে।

তারপর যখন যুগ খলীফা ঘোষণা করলেন যে, আফ্রিকার দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার জন্য এবং চিকিৎসার সুবিধার অভাবে রোগে আক্রান্তদের জন্য এবং স্কুল ও হাসপাতাল খোলার জন্য তাঁর এত অর্থের প্রয়োজন,তখন জামাতের সদস্যরা এই চেতনায় যা একজন আহমদীর হৃদয়ে আর্ত মানবতার প্রতি থাকা উচিত, এই অর্থ প্রদান করেন এবং এই প্রিয় জামাতের নিষ্ঠাবান সদস্যরা যুগ খলীফার দাবিতে সাড়া দিয়ে খলীফার পক্ষ থেকে দাবি করা অর্থেরও কয়েকগুণ বেশি অর্থ সাহায্য যুগ খলীফার সমীপে নিবেদন করলেন।

এরপর যখন যুগ খলীফা বললেন, "অর্থের সংকুলান তো হয়ে গিয়েছে,

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে। তোমরা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবংঅসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাকএবং আল্লাহতে ঈমান রাখ। (আলে ইমরান:১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Bibi & Jahanara Bibi From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (s)

এখন এসব স্কুল ও হাসপাতাল পরিচালনার জন্য জনবল দরকার। তখন ডাক্তার এবং শিক্ষকরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে নিজেদের উপস্থাপন করেন। এখন আফ্রিকার অবস্থা তুলনামূলক ভাল। সত্তরের দশকে যখন এই নুসরাত জাহান স্কিম শুরু হয়,তখন পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত প্রতিকূল। আর এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষগুলো বসবাস করত। কিছু ডাক্তার ও শিক্ষক ভাল চাকরি করলেও জীবন উৎসর্গ করার পর তারা গ্রামীণ এলাকায় গিয়ে থেকেছেন। বেশিরভাগ হাসপাতাল ও স্কুল গ্রামে ছিল যেখানে বিদ্যুত বা পানির সুবিধা ছিল না,কিন্তু দুঃখী মানবতার সেবা করার জন্য তাকে তার বয়আতের অঙ্গীকার পূরণ করতে হয়েছিল, তাই তারা কোনও প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার পরোয়া করেন নি। শুরুতে হাসপাতলের অবস্থা এমন ছিল যে একটি কাঠের টেবিল নিয়ে রোগিকে তাতে শুইয়ে রাখত, কয়েকটি লণ্ঠন বা গ্যাসের বাতি দিয়ে আলোর ব্যবস্থা হত,রোগীকে ছুরি,কাঁচি ইত্যাদি সরঞ্জাম যা পাওয়া যেত তা দিয়েই অপারেশন করত। অতঃপর তারা দোয়ায় নিযুক্ত হত যে, হে আল্লাহ্, আমার কাছে যা কিছু ছিল তা দিয়ে আমি চিকিৎসা করেছি। আমার খলীফা আমাকে বলেছিলেন, দোয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা করুন,মহান আল্লাহ্ আপনার হাতে অনেক নিরাময় দান করবেন। 'তাই তুমিই সুস্থতা দান করো।

আল্লাহ্ তা'লা এই ত্যাগ স্বীকারকারী ডাক্তারদের মর্যাদা রাখেন এবং এমন দূরারোগ্য রোগীরা সুস্থ হয়ে ওঠেন যে বিশ্ব অবাক হয়ে যায়। আর আর্থিক চাহিদাও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এমনভাবে মেটাতেন যে বড় বড় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও শহরের বড় বড় হাসপাতালের পরিবর্তে আমাদের ছোট গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার জন্য আসতে পছন্দ করতেন। একইভাবে শিক্ষকরাও মানবতার সেবার চেতনায় আত্মনিবেদন করেন এবং শিশুদের শিক্ষা দান করেন। ডাক্তার ও শিক্ষকদের এই সেবা আজও অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখুন এবং যারা এই খেদমত করছেন তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।"

(খুতবা জুমআ, ১৭ই অক্টোবর, ২০০৩)

বিগত বছরগুলিতে, যখন করোনা ভাইরাস পৃথিবীকে গ্রাস করেছিল এবং অপুষ্টি একটি সংকটে পরিণত হয়েছিল। উন্নত দেশগুলিও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, তবে দরিদ্র দেশগুলিতে যেখানে এই ভাইরাসের আগেও মানুষ ক্ষুধা ও দারিদ্র নিয়ে চিন্তিত ছিল, সেখানে এই ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে লোকেরা আরও বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল। এই কঠিন পরিস্থিতিতেও আহমদীয়া জামাতের সদস্যরা মানবিক চেতনায় বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে মানুষের সেবা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে,মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া হিউম্যানিটি ফার্স্টের অধীনে স্বেচ্ছায় গ্রাম ও শহরের হাজার হাজার মানুষকে রেশন, পানি,ফেস মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং অন্যান্য চিকিৎসা সেবা প্রদান করে এসেছে এবং বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করে বিপুল সংখ্যক রোগীকে মাস্ক সরবরাহ করেছে। মোটকথা, আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণায় আহমদীয়া জামাত একটি সর্বজনীন ধর্মীয় জামাত যার বৈশিষ্ট্য হল সেবা এবং যাদের স্লোগান হল ভালবাসা সবার তরে এবং কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়।

প্রিয় শ্রোতামন্ডলী! আহমদীয়া জামাত সারা বিশ্বে ইসলামের প্রকৃত খেলাফত ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধানে জনগণের সেবার মহান দায়িত্ব পালন করে চলেছে। আর জামাত আহমদীয়া সর্বদা এই নীতিতে মানুষের সেবার পথে থাকে إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الۡعَالَمِيۡنَ

(আল শোয়ারা: ১৬৫) অর্থাৎ আমার পুরস্কার বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। এছাড়াও দ্ব্যর্থ কণ্ঠে ঘোষণা করেছে:

لَا نُرِيۡدُ مِنۡكُمۡ جَزَاءً وَّلَا شُكُوۡرًا

(আল দাহার:১০) আমরা এই পরিষেবার বিনিময়ে আপনার কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাই না এবং আপনি আমাদের ধন্যবাদ দিন এটার কামনাও আমরা করি না।

আমাদের উচিত কল্যাণের মূর্ত প্রতীক হয়ে মানব সেবার কাজে অব্যাহত রাখা,যাতে আমাদের সমাজ স্বর্গ হয়ে ওঠে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই তৌফিক দান করুন।

আল্লাহ্ তা'লা তার শিক্ষার আলোকে জামা'তের সদস্যদের নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক সেবা করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

অন্যদের স্বীকারোক্তি

জামা'তে আহমদীয়ার মানব সেবার প্রেক্ষাপটে গুজরাতের ভূমিকম্প পীড়িত এলাকাগুলির জন্য কাদিয়ান থেকে ত্রাণ সামগ্রী রওয়ানা করার সময় পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী নথা সিং দালাম বলেন-

'রোগী,অভাবী ও দুঃখী মানবতার সেবাই বিশ্বের সর্বোচ্চ সেবা। পৃথিবীর সব ধর্মই মানুষের সেবা ও পারস্পরিক ভালবাসা শেখায়। শ্রী দালাম আহমদীয়া জামাত কর্তৃক সমাজের কল্যাণে যে কাজ করা হচ্ছে তার প্রশংসা করে বলেন, এই জামাত দেশে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা ছাড়াও দেশে যখনই কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এসেছে, তখনই তারা প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে দুঃখী মানবতার সেবা করেছে। এবং গুজরাতের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ৩৫ লক্ষ টাকার ত্রাণ সহায়তা পাঠিয়েছে। তিনি বলেন যে জামা'ত মুখ্যমন্ত্রী গুজরাত ত্রাণ তহবিলে একটি বড় অর্থ দান করেছে। লন্ডন ও অন্যান্য দেশ থেকে আহমদীয়া জামাতের টিম ভূজের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গিয়ে সেবা প্রদান করেছে,যা প্রশংসনীয়।

(দৈনিক জাগরণ জলন্ধর, ২৩ শে মার্চ, ২০০১)

আল্লাম্ ইকবাল লিখেছেন, 'পাঞ্জাবে ইসলামী আদর্শের শ্রেষ্ঠ নমুনা এই জামাতের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে যাকে কাদিয়ানী ফির্কা বলা হয়।"

(কউমি যিন্দেগী অউর মিল্লতে বায়যা পর এক ইমরানি নযর, পৃ: ৮৪)

আল্লামা নিয়ায ফতেহপুরী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)সম্পর্কে বলেন-

"এতে কোন দ্বিমত থাকতে পারে নাযে তিনি ইসলামিক শিষ্টাচারকে নবজীবন দান করেছেন, আর এমন এক জামাত সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন যার জীবনকে আমরা নিশ্চিতভাবে মহানবী (সা.)-এর আদর্শের প্রতিবিম্ব বলতে পারি।"

(মুলাহিযাত নিয়ায ফতেহপুরী,পৃ: ২৯)

দিল্লির সংবাদপত্র স্টেটমেন-এর সম্পাদক মহাশয় লিখেছেন-

'কাদিয়ানের পবিত্র শহরে এক ভারতীয় অবতার জন্ম গ্রহণ করেছেন যিনি তাঁর আশেপাশে পুণ্য ও নৈতিকতার আবেশ ঘটিয়েছে। এই উত্তম গুণাবলী তাঁর লক্ষাধিক মান্যকারীদের জীবনেও প্রতিফলিত হয়। "

(স্টেটমেন,দিল্লী, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯)

প্রিয় শ্রোতা! জামা'তে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদীর একটি বাণী দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

হুযুর (আ.) বলেন-

"আমি সত্যি বলছি,কোন ব্যক্তির ঈমান কখনোই সত্য হতে পারে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের আরামকে নিজের আরাম-আয়েশের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়। আমার কোন ভাই যদি যদি তার দুর্বলতা ও অসুস্থতা সত্ত্বেও আমার সামনে মাটিতে ঘুমায়, এবং আমি আমার স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সত্ত্বেও বিছানা দখল করে নিই যাতে সে তাতে বসতে না পারে,তারপরও যদি আমি উঠে না যাই এবং তাকে ভালবাসা ও করুণার সাথে আমার শয্যা দান না করি তবে আমার উপর আফসোস!

যদি আমর ভাই অসুস্থ হয় এবং কোন ব্যাথায় জর্জরিত হয়,তবে এটা আমার জন্য দুঃখজনক যদি আমি জেনেশুনে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তার সাথে কঠোর আচরণ করি,বরং আমার উচিত যেন তার কথায় ধৈর্য ধারণ করি এবং আমার দোয়ায় তার জন্য দোয়া করি কারণ সে আমার ভাই এবং সে আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ।

যদি আমার ভাই সহজ সরল হয় বা জ্ঞানের অভাব হয় বা সরলতার কারণে ভুল করে বসে তবে আমি তাকে উপহাস করব না বা তার সমালোচনা করব না কারণ এগুলোই ধ্বংসের পথ। কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তার হৃদয় কোমল হয়,যতক্ষণ না সে নিজেকে অন্য সবার থেকে নিকৃষ্ট মনে করে এবং সমস্ত মিথ্যা অপসারণ না করে। জাতির সেবক হওয়া নেতা হওয়ার লক্ষণ। আর গরীবদের সাথে মাথা নত করে নম্রভাবে কথা বলা আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়ভাজন হওয়ার লক্ষণ এবং মন্দের উত্তর ভাল দিয়ে দেওয়া সৌভাগ্যের প্রতীক। এবং ক্রোধ সংবরণ করা এবং কটু কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা হল পুরুষত্বের সর্বোচ্চ স্তর।"

(রূহানী খাযায়েন,৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৯৫)

পরিশেষে দোয়া করি যে,আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পবিত্র কুরআন, মহানবী (সা.)-এর হাদীস,হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর নির্দেশাবলী এবং সম্মানিত খলীফাগণের নির্দেশনার আলোকে মানব সেবাকে মনে করে Love for all hatred for none এর আকাশচুম্বী স্লোগান উত্থাপন করে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের বৈষম্য ছাড়াই মানব সেবা করার তৌফিক দান করুন।

****

যুগ ইমামের বাণী

কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Hasan Laskar From-Kutubuddin Laskar Sb. Banshra, 24 PGS (s)

যুগ ইমামের বাণী

শাহাদতের প্রাথমিক ধাপ হল খোদার পথে অবিচল ও অটল থাকা। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৩)

দোয়াপ্রার্থী: Late Younus Gazi From-Raju Gazi Sb. Ghutiari Shareef, 24 PGS (s)

জুমআর খুতবা

খায়বারের যুদ্ধে রওনা হওয়ার পূর্বে মহানবী (সা.) বলেন: যারা গনিমতের সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছে, তারা যেন আমার সাথে যাত্রা না করে। আমার সাথে কেবল তারাই যাত্রা করবে যারা জিহাদের আগ্রহ রাখে।

যি কারায এর যুদ্ধের সময় রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন–আজকের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী হল আবু কাতাদা (রা.) এবং শ্রেষ্ঠ পদাতিক সৈন্য হল সালামা বিনি আকওয়া

মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ পরিপন্থী কোনো মানত যেন পূর্ণ না করা হয়, আর সেই (জিনিস) মানত করাও বৈধ নয় যার মালিকানা বান্দার নেই।

যি কারাদ –এর যুদ্ধ, নাজাদ অভিমুখে সারিয়া আবান বিন সাঈদ (রা.) এবং খায়বারের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)–এর জীবনী

মাননীয় মহম্মদ আশরাফ সাহেব (মন্ডী বাহাউদ্দীন), মাননীয় হাবীব মহম্মদ শাস্ত্রী সাহেব (দ্বিতীয় নায়েব আমীর, কেনিয়া) এবং মাননীয় আনুবি মুদিঙ্গু সাহেব (জিম্বাবুয়ে)–এর স্মৃতিচারণ এবং জানাযা গায়েব

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত ৩১ শে জানুয়ারী, ২০২৫, এর জুমুআর খুতবা (৩১ সুলাহ, ১৪০৪ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন, গত শুক্রবার 'যী কারাদ'–এর যুদ্ধ (সম্পর্কে) আলোচনা হচ্ছিল। যেমনটি বলেছিলাম,মহানবী (সা.) এই যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে কয়েকজন সাহাবীকে শত্রুদল অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। এরপর তিনি (সা.) তাদের অনুসরণে স্বীয় সেনাদল নিয়ে যাত্রা করেন। এপ্রসঙ্গে আরো লেখা আছে, মহানবী (সা.) এবং সাহাবীরা যখন আগমন করেন তখন তাদেরকে দেখে শত্রু–সেনারা পালিয়ে যায়। মুসলমানরা শত্রু–শিবিরে পৌঁছলে সেখানে হযরত আবু কাতাদা (রা.)–র ঘোড়াটি দেখতে পান, যেটির পায়ের শিরা কাটা ছিল। একজন সাহাবী বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আবু কাতাদার ঘোড়ার পায়ের শিরা তো কেটে ফেলা হয়েছে! মহানবী (সা.) সেটির পাশে দাঁড়িয়ে দুবার বলেন, 'তোমার মঙ্গল হোক! যুদ্ধে তোমার শত্রুর কোনো অভাব নাই।' এরপর মহানবী (সা.) এবং সাহাবীরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সেই স্থানে পৌঁছেন যেখানে হযরত আবু কাতাদা (রা.) এবং মাসআদা মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। (গতশুক্রবার এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল)। তারা মনে করেন, হযরত আবু কাতাদা (রা.) চাদরাবৃত হয়ে পড়ে আছেন। একজন সাহাবী নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! মনে হচ্ছে আবু কাতাদা শহীদ হয়ে গেছেন!

মহানবী (সা.) বলেন, 'আল্লাহ্ আবু কাতাদার প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। সেই সত্তার কসম যিনি আমাকে সম্মানিত করেছেন! আবু কাতাদা তো শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করছে এবং রণসঙ্গীত গাইছে।'

হযরত আবু কাতাদা (রা.) বর্ণনা করেন, তারা অর্থাৎ মহানবী (সা.)–এর কাফেলা বা সেনাদল যখন আমার ঘোড়াকে পায়ের রগ কাটা অবস্থায় দেখতে পায় এবং নিহত ব্যক্তিকে আমার চাদরে আবৃত অবস্থায় দেখতে পায়– তখন তারা মনে করেন, সম্ভবত আমি শহীদ হয়ে গিয়েছি। হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে চাদর সরালে মাসআদার চেহারা দেখতে পান। তারা উভয়ে বলেন, আল্লাহু আকবর! আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন। হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এ–তো মাসআদা। তখন সাহাবীরাও তাকবীর বলেন। এর অল্প কিছুক্ষণ পরই হযরত আবু কাতাদা (রা.) উটের পাল হাঁকিয়ে মহানবী (সা.)–এর সমীপে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) বলেন, 'হে আবু কাতাদা! তুমি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছ। আবু কাতাদা অশ্বারোহীদের সর্দার। হে আবু কাতাদা! আল্লাহ্ তোমার মাঝে কল্যাণ সৃষ্টি করুন।' অপর রেওয়ায়েতে আছে, মহানবী (সা.) বলেন, 'তোমার সন্তান–সন্ততিকে প্রজন্ম পরম্পরায় কল্যাণমণ্ডিত করুন।' এরপর মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু কাতাদা! তোমার চেহারায় কী হয়েছে? হযরত আবু কাতাদা (রা.) বলেন, আমি বললাম, আমার পিতা–মাতা আপনার জন্য নিবেদিত! আমার (এখানে) একটি তির লেগেছিল। সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন! আমার ধারণা ছিল, আমি তিরটি বের করে ফেলেছি। মহানবী (সা.) বলেন, আবু কাতাদা! আমার কাছে আসো। আমি মহানবী (সা.)–এর নিকটে যাই। তিনি (সা.) পরম যত্নে তিরটি বের করে নিজের মুখের লালা (সেখানে) লাগিয়ে দেন এবং নিজের হাত সেটির ওপর রাখেন। হযরত আবু কাতাদা (রা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যিনি তাঁকে (সা.) নবুয়্যত দান করেছেন! আমার মনে হচ্ছিল যেন আমার কোনো আঘাতই লাগে নি আর ক্ষতও হয় নি। [গতবার উল্লেখ করা হয়েছিল, হযরত আবু কাতাদা (রা.) নিজেই তির (টেনে) বের করেছিলেন, তবে হতে পারে সেটির কোনো অংশ বা ফলা ভেতরে রয়ে গিয়েছিল যা তিনি (সা.) বের করেন। সেটির চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল।] আরেক রেওয়ায়েতে আছে, মহানবী (সা.) আবু কাতাদা (রা.)–কে দেখে বলেন, 'হে আল্লাহ্! তারকেশগুচ্ছ ও ত্বকে কল্যাণ দান করো।' আরো বলেন, তোমার মুখ উজ্জ্বল হয়েছে অর্থাৎ তুমি সফল হয়েছ। তিনি (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার মুখ উজ্জ্বল হয়েছে অর্থাৎ আপনি সফল হয়েছেন। এরপর যখন সত্তর বয়স বছরে হযরত আবু কাতাদা (রা.) ইন্তেকাল করেন তখন তার চেহারা দেখে মনে হতো যেন তার বয়স পনেরো বছর, অর্থাৎ তার চেহারা যুবকের মতো লাগত। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড,পৃ: ১০০–১০১)

এই যুদ্ধে হযরত সালামা (রা.)–র যী কারাদ–এ শত্রুর সাথে লড়াইয়ের উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায়: হযরত সালামা (রা.) বলেন, আমি শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে ছুটছিলাম, এমনকি সেই সত্তার কসম যিনি মহানবী (সা.)–কে সম্মানিত করেছেন! (এক পর্যায়ে) আমি আমার পেছনে কোনো সাহাবীকে দেখতে পাচ্ছিলাম না আর তাদের (ছুটে আসার) উড়ন্ত ধূলিকণাও দেখা যাচ্ছিল না। শত্রুরা সূর্যাস্তের পূর্বেই একটি ঘাঁটিতে পৌঁছে যায়, যেখানে যী কারাদ নামক একটি ঝরনা ছিল। তারা সেখান থেকে পানি পান করতে চায়। যখন তারা দেখে, আমি তাদের পেছনেই রয়েছি, তখন তারা সেখান থেকে সরে যায়। সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি এক ব্যক্তিকে দেখে তির নিক্ষেপ করি, সকালেও আমি তাকে (উদ্দেশ্য করে) তির নিক্ষেপ করেছিলাম; এখন দ্বিতীয় তির নিক্ষেপ করি আর দুটি তিরই তার (শরীরে) বিদ্ধ হয়। সে দুটি ঘোড়া ফেলে পালিয়ে যায়, তখন আমি সেই দুটিকে আটক করি; ইত্যবসরে মহানবী (সা.) পৌঁছে গিয়েছিলেন তাই সেগুলোকে মহানবী (সা.)–এর সমীপে হাঁকিয়ে নিয়ে আসি।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৮-৯৯)

মহানবী (সা.)-এর যী কারাদ পৌঁছানো সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, হযরত সালামা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) এশার সময় পৌঁছেন এবং ঝরনার কাছে শিবির স্থাপন করেন, যেখানে আমি শত্রুদের প্রতিহত করেছিলাম। তিনি (সা.) সবগুলো উট এবং শত্রুদের কাছ থেকে যা আমি ছিনিয়ে নিয়েছিলাম- সবকিছু নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছিলেন। হযরত বেলাল (রা.) সেই উটগুলোর মাঝ থেকে একটি উট জবাই করেন যা শত্রুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং মহানবী (সা.)-এর জন্য এর কলিজা ও কুঁজের মাংস ভুনা করেন। হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) খেজুর বোঝাইকৃত দশটি উট প্রেরণ করেন যা তিনি (সা.) যী কারাদ নামক স্থানে প্রাপ্ত হন। হযরত সালামা (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, আমি শত্রুদের পানি নিতে বাধা দিয়েছিলাম তাই তারা তৃষ্ণার্ত ছিল। আপনি যদি আমাকে একশ মুজাহিদসহ প্রেরণ করেন তাহলে আমি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের সকল গুপ্তচরকে হত্যা করব। তিনি (সা.) হাসতে থাকেন, এমনকি আগুনের আলোয় তাঁর পবিত্র দাঁত দৃশ্যমান হচ্ছিল। তিনি (সা.) বলেন, সালামা! তুমি কি (সত্যিই) এমনটি করতে পারবে? আমি নিবেদন করি, যিনি আপনাকে সম্মান দিয়েছেন সেই সত্তার কসম! অবশ্যই পারব। তিনি (সা.) বলেন, مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ তুমি যদি তাদেরকে কাবু করতে পারো তাহলে (তাদের প্রতি) কোমল ব্যবহার কোরো। এটি আরবের প্রবাদের মধ্য হতে একটি প্রবাদ, যার অর্থ হলো- সর্বোত্তম ক্ষমা হলো, নম্রতা প্রদর্শন করো এবং কঠোরতা পরিহার করো। তারা যদি চলে যায় তাহলে চলে যাক, এখন আর তাদের পিছু নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এই যুদ্ধে ঘটে যাওয়া আরেকটি ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সালামা (রা.) বলেন, প্রত্যুষে মহানবী (সা.) বলেন,

'আজকের সর্বোত্তম অশ্বারোহী আবু কাতাদা এবং সর্বোত্তম পদাতিক সালামা বিন আকওয়া।'

হযরত সালামা (রা.) বলেন, তিনি (সা.) আমাকে আরোহী ও পদাতিক উভয় হিসাবেই (গনিমতের) অংশ প্রদান করেন, এরপর আমাকে তাঁর উটনীতে নিজের পেছনে আরোহণ করান। এই সফরে হযরত সালামা (রা.)-র আরো একটিঘটনা বা রেওয়ায়েতের উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত সালামা (রা.) বলেন, মদীনায় ফেরত আসার সময় আমরা যখন মদীনার কাছাকাছি পৌঁছি তখন একজন আনসারী সাহাবী যিনি অনেক দ্রুত দৌড়াতে পারতেন, ঘোষণা দিয়ে বলেন, কেউ কি আছে যে আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতে চায়? অর্থাৎ পবিত্র মদীনা পর্যন্ত আমার সাথে দৌড়ে যাবে? তিনি কয়েকবার এই বাক্য পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর উটের ওপরে তাঁর পেছনেই আরোহিত ছিলাম। আমি সেই আনসারী সাহাবীকে বলি, তুমি কি কোনো সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করবে না? তোমার কি কোনো ভদ্রলোকের (সম্মানের) ভয় নেই যে, এই ঘোষণা দিয়ে বেড়াচ্ছো? তিনি বলেন, না, মহানবী (সা.) ব্যতিরেকে আমি আর কাউকে ভয় করি না। তখন আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি নিবেদিত। আপনি আমাকে এই ব্যক্তির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতার অনুমতি দিন। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, তুমি যদি চাও তাহলে প্রতিযোগিতা করতে পারো। আমি সেই ব্যক্তিকে বলি, তাহলে চলো। এরপর তিনি বলেন, আমি আমার পা ভাঁজ করে লাফ দিয়ে দৌড়তে আরম্ভ করি আর আমি একটি বা দুটি উপত্যকা পর্যন্ত দৌড়ে তার পেছনে ছিলাম। অর্থাৎ সে সামনে আর আমি পেছনে ছিলাম। আর তখন আমি আমার শক্তি সঞ্চয় করছিলাম। এরপর আমি আমার গতি বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলি আর তার দুই কাঁধের মাঝে চাপড় দিয়ে বলি, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমার চেয়ে এগিয়ে গেছি। তিনি মুচকি হেসে বলেন, আমারও তা-ই মনে হয়। আর এভাবে আমি এই দৌড় প্রতিযোগিতায় সামনে এগিয়ে যাই, এমনকি আমরা মদীনায় পৌঁছে যাই।

এই যুদ্ধাভিযানের জন্য মহানবী (সা.) কতদিন মদীনার বাহিরে ছিলেন এর বিশদ বিবরণে লেখা হয়েছে, মহানবী (সা.) বুধবার সকালে যাত্রা করেন এবং তিনি (সা.) এক রাত এক দিন যী কারাদ-এ অবস্থান করেন যেন শত্রুদের কোনো সংবাদ পাওয়া যায়। এরপর তিনি (সা.) সোমবার মদীনায় ফিরে আসেন। আর এভাবে তিনি (সা.) পাঁচ রাত মদীনার বাইরে অবস্থান করেন।

এই যুদ্ধে যেসব সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন তাদের বিবরণ হলো, মুসলমানদের মধ্যে হযরত মুহরেয বিন নাযলা শহীদ হন। ইবনে হিশামের মতে ইবনে ওয়াক্কাস বিন মুজায্‌যেয-ও শহীদ হয়েছিলেন। তারা ছাড়া হযরত আবু যার (রা.)-র পুত্রকে যুদ্ধের পূর্বেই উটের বাথানে শহীদ করে দেওয়া হয়েছিল। কাফিরদের সম্পর্কে লেখা হয়েছে, কাফিরদের মধ্য থেকে আব্দুর রহমান বিন উয়ায়না, হুবায়েব বিন উয়ায়না, মাসআদা বিন হাকামা ফাযারী, ওবার এবং তার পুত্র আমর নিহত হয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড,পৃ: ১০০-১০৪) (উমদাতুল ক্বারী, খণ্ড-১৪, পৃ: ২৮৬)

হযরত আবু যার (রা.)-র স্ত্রীকে শত্রুরা বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছিল। আক্রমণকারীরা হযরত আবু যার (রা.)-র স্ত্রীকে আটক করে নিজেদের সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল আর তারা তাকে বেঁধে রেখেছিল। রাতের বেলা তারা গবাদি পশুপাল নিজেদের ঘরের সামনে রাখত। এক রাতে সেই মহিলা তার বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে যান এবং কাছেই বেঁধে রাখা উটগুলোর কাছে যান। যখনই তিনি কোনো উটের কাছে যেতেন তখন সেটি শব্দ করত। অর্থাৎ সেটি চিৎকার করত আর তিনি সেটিকে ছেড়ে দিতেন। এমনকি তিনি যখন আযবা-র কাছে পৌঁছেন; [এটি মহানবী (সা.)-এর সেই উটনী যেটিকে শত্রুরা ছিনতাই করে সাথে নিয়ে এসেছিল;] সেটির কাছে যখন পৌঁছেন তখন সেটি কোনো শব্দ করে নি বা কোনো চিৎকারও করে নি, একেবারেই শান্ত ছিল। সেটি প্রশিক্ষিত উটনী ছিল। সেই মহিলা সেটির পিঠে আরোহণ করেন এবং সেটিকে পা দিয়ে আঘাত করতেই সেটি ছুটতে আরম্ভ করে। শত্রুরা তার পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অবগত হলে তারা তাকে আটক করতে চায়, কিন্তু তিনি তাদের হাতে ধরা পড়েন নি।

বর্ণনাকারী বলেন, সেই মহিলা আল্লাহ্‌র সমীপে একটি মানত করেন, আল্লাহ্ তা'লা যদি তাকে এই উটনীর মাধ্যমে মুক্তি দেন তাহলে তিনি অবশ্যই সেটিকে জবাই করে দেবেন। যখন সে মদীনায় আসে আর মানুষজন তাকে দেখে তখন তারা বলে, এতো মহানবী (সা.)-এর উটনী আযবা। সেই মহিলা বলে, আমি তো মানত করেছি, যদি আল্লাহ্ আমাকে এই উটনীর মাধ্যমে উদ্ধার করেন তাহলে আমি এটি কুরবানী করে দিবো। এই বাগ্‌বিতণ্ডার এক পর্যায়ে লোকেরা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় এবং তাঁর কাছে এসব কথা (সবিস্তারে) বর্ণনা করে। মহানবী (সা.)বলেন, সুবহানাল্লাহ্, এই মহিলা এই উটনীকে কত মন্দ প্রতিদান দিয়েছে! [এটি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে, অথচ সে তাকে এই প্রতিদান দিচ্ছে!] এই মানত করার মাধ্যমে (মন্দ প্রতিদান দিচ্ছে) যে, আল্লাহ্ যদি তাকে এই উটনীর মাধ্যমে উদ্ধার করেন তাহলে তিনি এটিকে জবাই করবেন- এটি কোনো উত্তম প্রতিদান নয়। এরপর তিনি (সা.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ পরিপন্থী কোনো মানত যেন পূর্ণ না করা হয়, আর সেই (জিনিস) মানত করাও বৈধ নয় যার মালিকানা বান্দার নেই। অর্থাৎ তুমি তো এর মালিকও নও।

তিনি (সা.) বলেন, এটি আমার উটনী, (তাই) তুমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ভালোয় ভালোয় নিজের বাড়ি ফিরে যাও।

(সহীহ মুসলিম, ৮ম খণ্ড,,পৃ:২৩৬-২৩৭)

এখন একটি সেনাভিযানের উল্লেখ করব। এটিকে নাজদ অভিমুখে হযরত আবান বিন সাঈদ (রা.)-র সেনাভিযান বলা হয়। এই সেনাভিযান সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

(গাযওয়াত ও সারিয়্য, প্রণেতা-মহম্মদ আজহার ফরিদ, পৃ: ৩৯০)

যদিও আরেক রেওয়ায়েতে এই সেনাভিযানের সময়কাল সপ্তম হিজরীর জমাদিউস সানী বলা হয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-ও এই সেনাভিযান সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১২৮) (সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৪৩৭)

এই সেনাভিযানের সময়কাল সপ্তম হিজরীর মহররম (মাস) অধিকতর যুক্তিসঙ্গত; কেননা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে, খায়বার অভিমুখে যাত্রা শুরু করার পূর্বে মদীনা থেকে নাজদ অভিমুখে হযরত আবান বিন সাঈদ (রা.)-কে প্রেরণ করা হয়। আর খায়বার অভিমুখে যাত্রা হয়েছিল সপ্তম হিজরীর মহররমে। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১১৫)

হযরত আবান (রা.)-র পরিচয় হলো, তার পিতা জ্যেষ্ঠ কুরাইশের একজন ছিলেন। তার ভাই আমর এবং খালেদ পূর্বেই মুসলমান হয়ে

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা লঘু করিতে চাহেন, কারণ মানুষকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। (আন-নিসা: ২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)

যুগ ইমামের বাণী

জ্ঞান বলতে যুক্তি কিম্বা দর্শনশাস্ত্রকে বোঝানো হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা আল্লাহ তা'লা (মানুষকে) কেবল নিজ কৃপাগুণে দান করেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: Late Haji Ansar From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)

গিয়েছিলেন এবং ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবান (রা.) বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ থেকে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় হযরত উসমান (রা.)-কে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আমর এবং খালেদ ইথিওপিয়া থেকে ফেরত এসে আবান (রা.)-কে ডেকে পাঠান। এমনকি তারা তিনজন একত্রে খায়বারের দিনগুলিতে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং আবান (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। এক রেওয়ায়েত অনুসারে, হযরত আবান বিন সাঈদ (রা.) হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং খায়বারের যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের সময় আবান (রা.) বাহরাইনের গভর্নর ছিলেন। এরপর তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-র কাছে আসেন এবং তারপর সিরিয়ায় চলে যান আর তেরো হিজরীতে তিনি শহীদ হন। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, তিনি ২৭ হিজরীতে হযরত উসমান (রা.)-র খিলাফতকালে মৃত্যু বরণ করেন।

(উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৪৮) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ১ম খণ্ড,পৃ: ১৬৮-১৭০)

খায়বারের যুদ্ধে যাত্রার প্রাক্কালে মহানবী (সা.) হযরত আবান বিন সাঈদ (রা.)-র নেতৃত্বে নাজদ অভিমুখে একটি সেনাদল প্রেরণ করেছিলেন। নাজদ একটি শুষ্ক মরু অঞ্চল হলেও উর্বর ভূমি ছিল, যেখানে বহু উপত্যকা ও পর্বতমালা রয়েছে। এটি দক্ষিণে ইয়েমেন আর উত্তরে সিরিয়ার মরুভূমি ও ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত। এর পশ্চিমে হিজায মরুভূমি অবস্থিত। এই অঞ্চলটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বারোশ মিটার উঁচু আর এই উচ্চতার কারণেই এটিকে নাজদ বলা হয়। এই সৈন্যদলের উদ্দেশ্য ছিল, মহানবী (সা.)- এর অনুপস্থিতিতে মদীনাকে বিভিন্ন শত্রু গোত্র থেকে নিরাপদ রাখা। এই গোত্রগুলো সর্বদা এই সুযোগ খুঁজতে থাকত যে, কখন মোক্ষম সুযোগ পাওয়া যাবে আর মদীনায় আক্রমণ করবে। সাহাবীদেরসহ মহানবী (সা.)-এর মদীনার বাহিরে যাওয়াকে মদীনায় আক্রমণের মোক্ষম সুযোগ মনে করত। শত্রুরা মনে করত, এখন মহানবী (সা.) মদীনার বাহিরে আছেন আর মানুষও তাঁর সাথে আছে; সেনাদল সাথে রয়েছে, মদীনায় অনেক কম মানুষ রয়েছে; তাই আমরা আক্রমণ করে মদীনা দখল করতে পারব। এই আশঙ্কার কারণে মহানবী (সা.) যখনই কোনো যুদ্ধে যেতেন তখন এমন সব (শত্রু) গোত্রের অভিমুখেও কিছু সাহাবীকে প্রেরণ করতেন।

(ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ২৯৭) দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪১২)

এই সেনাভিযানের উল্লেখ সহীহ্ বুখারীতে এভাবে রয়েছে: মহানবী (সা.) হযরত আবান (রা.)-কে একটি সেনাভিযানে (আমীর) মনোনীত করে মদীনা থেকে নাজদ অভিমুখে প্রেরণ করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, এরপর আবান (রা.) এবং তার সঙ্গীরা মহানবী (সা.)-এর কাছে খায়বারে আসেন, ততক্ষণে তিনি (সা.) খায়বার বিজয় সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এরা যেহেতু খায়বার বিজয়ের পরে এসেছে তাই এদেরকে (গনিমতের) অংশ দেবেন না। অর্থাৎ খায়বারের গনিমতের সম্পদ থেকে তাদের কোনো অংশ পাওয়া উচিত নয়। যার ফলে তাদের দুইজনের মধ্যে পারস্পরিক তর্ক হয়। মহানবী (সা.) বলেন, হে আবান! বসে পড়ো। আর তিনি (সা.) তাকে অংশ দেন নি, কেননা তিনি সরাসরি খায়বারের যুদ্ধে অংশ নেন নি, সম্ভবত এটাই কারণ।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪২৩৮,৪২৩৯) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১২৮)

এরপর ইতিহাসে অনেক বিখ্যাত একটি যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেটিকে খায়বারের যুদ্ধ বলা হয়। খায়বার একটি বিস্তৃত শস্যশ্যামল উপত্যকা যা বিভিন্ন ঝরনা ও প্রচুর পানির উপস্থিতির কারণে সবুজ-শ্যামল আর আরব উপদ্বীপের সবচেয়ে বড়ো খেজুরের বাগানের জন্য বিখ্যাত। এর উর্বরতার অনুমান এর মাধ্যমেও করা যায় যে, খায়বারের শুধুমাত্র একটি উপত্যকা, যেটি কাতিবা নামে পরিচিতি, সেখানে চল্লিশ হাজার খেজুর গাছ ছিল। খায়বার উপত্যকাটি মদীনার উত্তরদিকে আনুমানিক ৯৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এখানে প্রাচীনকাল থেকেই ইহুদীদের বসতি ছিল। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, হযরত মূসা (আ.)-এর যুগ থেকে এখানে বনী ইসরাঈলের ইহুদীদের বসবাস ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, বুখতনসর (তথা নেবুচ্যাডনেজার)-এর যুগে ইহুদীরা এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। আরো কিছু বিবরণ রয়েছে। সব কিছুর মূল কথা হলো, খায়বারে প্রাচীন কাল থেকেই ইহুদীদের বসবাস ছিল। আর বড়ো বড়ো দুর্গ নির্মাণ করে এরা এখানে বাস করত। তাদের দৃষ্টিতে এ জায়গার অনেক গুরুত্ব ছিল এবং বলা হয়, এখনো আছে। হিব্রু ভাষায় খায়বার শব্দের অর্থ দুর্গ। ইহুদীদের কিছু গোত্র মদীনাতেও বসবাস করত, কিন্তু খায়বারের ইহুদীরা যে-কারণে ব্যতিক্রম ছিল তা হলো, এখানকার ইহুদীরা অন্য সকল ইহুদীর চেয়ে সাহসিকতা এবং রণক্ষেত্রে অবিচলতা প্রদর্শনে দক্ষ ছিল আর তাদের পারস্পরিক ঐক্যও অন্যদের তুলনায় অধিক ছিল, যে-কারণে এরা আরব ভূখণ্ডে দোর্দণ্ড প্রতাপ ও শক্তিশালী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত হতো।

(তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮১, পৃ: ৮১) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ৬৬) (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩২৮-৩৩১)

মদীনার ইহুদী হোক কিংবা খায়বারের ইহুদী- মহানবী (সা.) এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা বিদ্রোহের পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিল। বিদ্বেষ ও শত্রুতায় ক্রমবর্ধমান এই জাতি ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তাকে ধ্বংস করার জন্য নিজেদের সকল শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত করতে কিছু আর বাকি রাখে নি। অথচ এর বিপরীতে মহানবী (সা.) মদীনার ইহুদীদের সাথেসর্বদা কোমল ব্যবহার করেছেন। তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি করেছেন এবং তারা যখনই চুক্তিভঙ্গ করত কিংবা বিরুদ্ধাচরণ করত তখন মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম তাদেরকে ক্ষমা ও মার্জনা করার চেষ্টাই করতেন। এমনকি তারা অসংখ্যবার মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার চেষ্টাও করেছিল। চুক্তিভঙ্গ করে বহিঃশক্তিকে মদীনায় আক্রমণ করতে সাহায্য করেছে, যার বিচারে শাস্তিস্বরূপ সকল ইহুদীকে যদি চরম কঠিন শাস্তিও প্রদান করা হতো তবে তা একেবারেই ন্যায়বিচার বলে পরিগণিত হতো। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর অনুপম ক্ষমা ও অনুগ্রহের মান এমন ছিল যে, এতকিছুর পরও তাদের জান-মালের এমন নিরাপত্তা বিধান করেছেন যে, কেবল মদীনা থেকে নির্বাসিত করে বলেছেন, সাথে করে যা কিছু নিয়ে যেতে চাও নিতে পারো। মহানবী (সা.)-এর উদ্দেশ্য যদি (নাউযুবিল্লাহ্) বলপ্রয়োগ হতো তাহলে মদীনার ইহুদীদের বার বার চুক্তিভঙ্গের কারণে তাদেরকে কখনো ক্ষমা করতেন না। মহানবী (সা.)- এর উদ্দেশ্য যদি রক্তপাত করা হতো তাহলে বনু কায়নুকা এবং বনু নযীরকে কখনো প্রাণের নিরাপত্তা প্রদান করে মদীনা থেকে নিরাপদে চলে যেতে দিতেন না। মহানবী (সা.)-এর উদ্দেশ্য যদি ধনসম্পদ অর্জন করা হতো তাহলে বনু নযীর, যাদেরকে আরব উপদ্বীপে সবচেয়ে সম্পদশালী গোষ্ঠী মনে করা হতো, কখনো মশক ও বড়ো বড়ো থলে ভরতি করে সোনা-রূপা মদীনাবাসীর সামনে তাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারত না। আর যে সদাচার, অনুগ্রহ, ক্ষমা ও মার্জনাপূর্ণ ব্যবহার মহানবী (সা.) মদীনার সেসব ইহুদীর সাথে করেছিলেন, এতে খায়বারে বসতি স্থাপনের পর এসব লোকের উচিত ছিল ইসলাম ও এর প্রতিষ্ঠাতার অনুকূলে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপত্তার পরিবেশে বসবাস করা। মদীনা থেকে নির্বাসিত হওয়ার পর মদীনার ইহুদীদের একটি অংশ খায়বারে গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু খায়বার যা কি-না প্রথম থেকেই বৃহৎ সামরিক শক্তিসম্পন্ন ছিল, তা এখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের কলকাঠি নাড়ার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই খায়বারের ইহুদীরাই, যারা একটি বড়ো প্রতিনিধিদল নিয়ে মক্কার পৌত্তলিকদের সাথে সাক্ষাৎ করতে মক্কায় যায়, যাদের মধ্যে খায়বারের বড়ো বড়ো ইহুদী নেতারাও ছিল, আর মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তা এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার একটি গভীর ষড়যন্ত্র করে আর তাদেরকে দলে ভেড়ানোর পর আশপাশের বিভিন্ন গোত্রে তাদের প্রতিনিধিদল যায়। আর একটি বিশাল দল গঠন করে তখনকার ইতিহাস অনুযায়ী পনেরো হাজার সেনাদল নিয়ে মদীনায় আক্রমণ করে বসে, যা ইসলামের ইতিহাসে আহযাবের যুদ্ধ বা পরিখার যুদ্ধ নামে সুপরিচিত; পূর্বে এর উল্লেখ করা হয়েছে। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই, যদি ইসলাম ধর্মের সাথে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ সাহায্য-সমর্থন না থাকত তাহলে মুসলমানদের পাশাপাশি সম্ভবত মদীনার নাম-গন্ধও বিলীন হয়ে যেত। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই, খায়বারের ইহুদীরাই এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা ছিল, যারা এখন সর্বদা মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিল। মদীনায় বসবাসকারী বনু কুরাইযাকে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার অবস্থা আদমের অবস্থার অনুরূপ। তিনি তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। (আলে ইমরান:৬০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: "সর্বদা সত্য কথা বল, যখন তোমাদের কাছে আমানত রক্ষিত হয়, তখন তা আত্মসাৎ করিও না এবং প্রতিবেশীর সহিত সর্বদা সদয় আচরণ কর।" (বাইহাকি ফি শোবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

কারণে প্রথমবারে প্রদত্ত চরম শাস্তিও খায়বারের ইহুদীদেরকে তাদের ষড়যন্ত্রে পরিবর্তন সৃষ্টির কারণ হতে পারে নি। এজন্য এটি অতি আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এই চুক্তিভঙ্গকারী ও ষড়যন্ত্রকারী জাতির বিরুদ্ধে যেন সরাসরি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, যাতে এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ স্থানে শান্তিতে ও নির্ভয়ে নিজ নিজ ধর্ম ও বিশ্বাস অনুসারে জীবনযাপন করতে পারে, যেভাবে (বলা হয়েছে), يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ অর্থাৎ ধর্ম কেবল আল্লাহ্‌তা'লার খাতিরে নিবেদিত হোক। ধর্মে যেন কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ না থাকে, কেননা এটি আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার বিষয়।

একজন বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ মন্টগোমারি ওয়াট, যিনি ইসলাম ও এর প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, তিনি নিজেও তার পুস্তকে একথা লেখেন যার অনুবাদ হলো: খায়বারে আক্রমণের সরল ও স্পষ্ট কারণ হলো, তারা তাদের সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করে [অর্থাৎ খায়বারবাসীরা অঢেল (সম্পদ) ব্যবহার করে] নিজেদের প্রতিবেশী আরবদেরকে প্ররোচিত করেছিল, যাতে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে।

(Muhammad Prophet and Stateman by W.Montomomery Watt pg: 189)

তাই এটি ছিল সেই বিশেষ প্রেক্ষাপট যার কারণে মহানবী (সা.) ঐশী নির্দেশ অনুসারে খায়বার অভিমুখে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আল্লামা ইবনে সা'দ লেখেন, খায়বারের যুদ্ধ সপ্তম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল (মাসে) সংঘটিত হয়। ইবনে উকবা ও আল্লামা ইবনে ইসহাকের মতে, মহানবী (সা.) যিলহজ্জ মাসে হুদাইবিয়া থেকে মদীনায় ফেরত আসেন এবং তিনি (সা.) মদীনায় প্রায় বিশ রাত অবস্থান করেন। এরপর খায়বারঅভিমুখে যাত্রা করেন আর এটি মহররম মাস ছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১১৫)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-ও সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে অন্যান্য বিষয়ের যে নোট লিখেছেন তাতে তিনি (রা.) খায়বারের এই যুদ্ধকে সপ্তম হিজরীর মহররম ও সফর মাসের যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৮৩৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হুদাইবিয়া থেকে ফেরত আসার প্রায় পাঁচ মাস পর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ইহুদীদের যারা মদীনা থেকে মাত্র কয়েক মঞ্জিল দূরে ছিল আর যেখান থেকে মদীনার বিরুদ্ধে সহজেই ষড়যন্ত্র করা যেত- (সেখান থেকে) বিতাড়িত করা হবে। অতএব, তিনি (সা.) ১৬০০জন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে খায়বার অভিমুখে যাত্রা করেন।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড, পৃ: ৩২৫)

কোনো কোনো ঐতিহাসিক, হুদাইবিয়ার সন্ধির পাঁচ মাস পর এর তারিখ বর্ণনা করেন। আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও দীবাচাহ্ তাফসীরুল কুরআনে একথাই বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং হাদীস বিশারদগণ হুদাইবিয়া সন্ধির অল্প কিছুদিন পরই মহররম মাসে এটি (তথা খায়বার যাত্রা) হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন। আর হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-ও এসম্পর্কে এটিই লিখেছেন। প্রকৃত বিষয় আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি নিঃসন্দেহে এক মহাবিজয় ছিল। পবিত্র কুরআন একে এক মহাবিজয় বলে অভিহিত করেছে। যেমনটি বলেছে, إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। আর এটি সুস্পষ্ট বিজয়ের সেই দরজা ছিল, যেটি অতিক্রম করে খায়বার ও মক্কা-বিজয়ের ন্যায় সুমহান বিজয় অর্জিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'লা (তখনই) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যখন হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে ফেরত আসার সময় মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে সূরা ফাতহ অবতীর্ণ হয়। এ সূরায় (আল্লাহ্ তা'লা) খায়বারের বিজয়ের সুসংবাদ এভাবে দিয়েছেন:

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ۙ وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ-

(সূরা আল-ফাতহ: ১৯-২১)

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি তখন পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট হন, যখন তারা গাছের নীচে তোমার (হাতে) বয়আত করছিল এবং তিনি তাদের হৃদয়ের ঈমানের বিষয়ে সবিশেষ অবগত হন। এর ফলে তিনি তাদের হৃদয়ে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন এবং তাদেরকে এক আসন্ন বিজয়ের (সুসংবাদ) দান করেন; (অর্থাৎ খায়বারের বিজয়।) আর অনেক গনিমতের সম্পদ দান করেন (অর্থাৎ খায়বারের সম্পদ যা তারা পেয়েছিল) যা তারা সংগ্রহ করছিল আর আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ্ তোমাদেরকে (আরো) বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা তোমরা লাভ করবে। এরপর তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) তোমাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে দান করেছেন।

সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি এবং মদীনায় একজন স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের বিশদ বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে: মহানবী (সা.) যখন খায়বার অভিমুখে যাবার জন্য ঘোষণা প্রদান করান, তখন তিনি ঘোষণা করান, যারা হুদাইবিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন কেবল তারাই (তাঁর) সাথে যাবেন। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.) বলেন, যারা গনিমতের সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছে, তারা যেন আমার সাথে যাত্রা না করে। আমার সাথে কেবল তারাই যাত্রা করবে যারা জিহাদের আগ্রহ রাখে।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১১৫) (তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ:৮১)

ইবনে হিশামের মতে, হযরত নুমায়লা বিন আব্দুল্লাহ্ লাইসি (রা.)-কে মহানবী (সা.) মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। অন্যদিকে ইমাম বুখারীর মতে, তিনি (সা.) হযরত সিবাহ্ বিন উরফাতা (রা.)-কে নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১১৫) (আততারিখুস সাগীর, লি ইমাম বুখারী, পৃ:৪৩)

আল্লামা ইবনে ইসহাক এবং ইবনে সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন, সর্বপ্রথম পতাকার উল্লেখ পাওয়া যায় খায়বারের যুদ্ধে; এর পূর্বে কেবল ছোটো ছোটো নিশান (বা ঝাণ্ডা) ব্যবহৃত হতো। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত হুবাব বিন মুনযের এবং হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) প্রমুখের হাতে পতাকা তুলে দেন। মহানবী (সা.)-এর পতাকাটি ছিল কালো রঙের, যা হযরত আয়েশা (রা.)-র চাদর দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছিল। এর নাম ছিল 'উকাব' আর এই পতাকাটি হযরত হুবাব বিন মুনযের (রা.)-র কাছে ছিল। (আসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫২)

রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রা.)-কেও একটি পতাকা দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই পতাকা খায়বারে দেওয়া হয়েছিল কারণ হযরত আলী (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে রওয়ানা হতে পারেন নি, কেননা তিনি (রা.) চোখের পীড়ায় ভুগছিলেন ফলে তিনি (স্পষ্টভাবে) কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। তবে পরে তিনি (রা.) অস্থির হয়ে রওয়ানা হন এবং খায়বারে গিয়ে পৌঁছেন। [তিনি ধৈর্য ধরতে পারেন নি।] এই অভিযানে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) তাঁর (সা.) সফরসঙ্গী ছিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১১৫)

এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ছয়সাতজন মহিলা সাহাবী এই অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন এবং আরেক রেওয়ায়েত মোতাবেক কুড়িজন মহিলা সাহাবী এই অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন।

হযরত উম্মে সিনান আসলামিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন খায়বারের যুদ্ধের সংকল্প করেন, তখন আমি তাঁর সমীপে উপস্থিত হই এবং নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! যদি অনুমতি দেন তাহলে আমিও সাথে যেতে চাই। আমি (পানির) মশকগুলো পরিষ্কার করব এবং সৈন্যদের সরঞ্জামের সুরক্ষা নিশ্চিত করব আর কেউ অসুস্থ বা আহত হলে আমি তার চিকিৎসা করব। তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে অনুমতি প্রদান করেন। একইভাবে বনু গিফারের কয়েকজন নারী মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাই, আমরা আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করব এবং আমাদের সাধ্যানুযায়ী সৈন্যদের সাহায্য করব। মহানবী (সা.) তাদেরকেও অনুমতি প্রদান করেন আর তাদের মঙ্গলের জন্য দোয়া করেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তাহারা কি জানে না যে,তাহারা যাহা কিছু গোপন করে এবং যাহা কিছু প্রকাশ করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবই জানেন? (আল বাকারা: ৭৮)

দোয়াপ্রার্থী: **Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal, From Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)**

মহান আল্লাহর বাণী

তোমরা সকল নামাযের, বিশেষ করিয়া মধ্যবর্তী নামাযের সংরক্ষণ কর, এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে অনুগত হইয়া দণ্ডায়মান হও।

(আল বাকারা: ২৩৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Mirza Naeema Begum & Family Bithari, 24 PGS (N)**

(দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্, ৮ম খণ্ড,পৃ: ৩৭১) (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-২৭২৯)

মহানবী (সা.) এবং তাঁর (সা.) সাহাবীদের এই প্রস্তুতির কথা যখন মদীনার ইহুদীরা অবহিত হয়, তখন তারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তারা অনুধাবন করে, যদি তিনি (সা.) খায়বারে প্রবেশ করেন তাহলে খায়বার ধ্বংস হয়ে যাবে যেভাবে বনু কায়নুকা, বনু নযীর ও বনু কুরায়যা ধ্বংস হয়েছিল। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১১৬

মদীনার ইহুদীরা যথেষ্ট সম্পদশালী ছিল এবং মদীনার মুসলমানরা আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তাদের কাছ থেকে ঋণ নিত। তখন খায়বারের ইহুদীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে মদীনার ইহুদীরা মুসলমানদেরকে উত্ত্যক্ত করা ও যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার জন্য দ্রুত নিজেদের দেওয়া ঋণ ফেরত চাইতে আরম্ভ করে।

একজন সাহাবীর ঘটনা পাওয়া যায়, হযরত ইবনে আবী হাদরাদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আবু শাহম নামক এক ইহুদীর কাছ থেকে ৫ দিরহাম এবং আরেক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ৪ দিরহাম ঋণ নিয়েছিলেন। (সেই) ইহুদী ঋণের অর্থ ফেরত চাইলে ইবনে আবী হাদরাদ (রা.) তাকে বলেন, আমাকে কিছু সময় দাও, আমি খায়বার থেকে ফিরে এসে ইনশাআল্লাহ্ তোমার প্রাপ্য অর্থ তোমাকে বুঝিয়ে দিবো, কেননা আল্লাহ্ তাঁর রসূল (সা.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, খায়বার তাদেরকে গনিমত প্রদান করবে। আবু শাহম নামক সেই ইহুদী হিংসা ও শত্রুতার বশে বলে, তুমি কি মনে করো খায়বারবাসীদের সাথে লড়াই করা আমাদের মতো সাধারণ বেদুইনদের সাথে লড়াই করার মতো সহজ? তওরাতের কসম! সেখানে দশ হাজার দক্ষ যোদ্ধা রয়েছে। এই দুইজন নিজেদের এই বিচার নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়। তখন যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থা বিরাজ করছিল। এই ইহুদী চরম বিদ্বেষে খায়বারের ইহুদীদের সমর্থন এবং (তাদের প্রতি) সহমর্মিতা প্রদর্শন করছিল আর মুসলমান সেনাদলকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপও করছিল। মহানবী (সা.) রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন; সেই ইহুদী কোনো শাস্তিও পেতে পারত। কিন্তু পরম ধৈর্য, সংযম, ন্যায়বিচার ও সহনশীলতার এই আদর্শ দেখা যায় যে, মহানবী (সা.) বলেন, এই ইহুদীকে তার প্রাপ্য প্রদান করো। ইবনে আবী হাদরাদ (রা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ আবির্ভূত করেছেন! এই মুহূর্তে তার প্রাপ্য পরিশোধ করার সামর্থ্য আমার নেই। তিনি (সা.) বলেন, যেভাবেই পারো তার প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দাও। ইবনে আবী হাদরাদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আমার মাথার পাগড়ি খুলে সেটিকে লুঙ্গি হিসেবে পরিধান করি আর পরনের যে চাদরটা লুঙ্গি হিসেবে পরতাম, সেটা বাজারে নিয়ে বিক্রি করে তার প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দিই আর আমি অন্য কাপড় পরিধান করি। এই অন্য কাপড়টি ছিল একটি চাদর, যেটি সালমা বিন আসলাম, আবার আরেক রেওয়ায়েত অনুসারে একজন বৃদ্ধা সাহাবী তাকে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ সেই বৃদ্ধা সাহাবী পুরো বিষয়টি জানার পর উপহারস্বরূপ এটি তাকে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লার বিধান দেখুন! খায়বারে সেই সাহাবী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করেন যার মাঝে একজন ইহুদী নারীও ছিল, যে সম্পর্কের দিক দিয়ে সেই আবু শাহম নামক ইহুদীর আত্মীয়া ছিল। এরপর তিনি পরবর্তীতে সেই ইহুদীর কাছেই সেই নারীকে বিক্রি করেন।

(দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্, ৮ম খণ্ড, প ৃ: ৩৭৩-৩৭৪) (ফতাহ খায়বার,পৃ: ৬৮)

খায়বার অভিমুখে অগ্রসর হবার সংবাদ পেয়ে মদীনার ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে কেবলমাত্র ঈর্ষা, শত্রুতা ও বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং আশজাআ' গোত্রের একজন বেদুইনকে ভাড়া করে তৎক্ষণাৎ মুসলমানদের যুদ্ধের প্রস্তুতির ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ খায়বারের ইহুদীদের নিকট প্রেরণ করে; সাথে আরো বলে পাঠায়, তারা যেন নির্ভয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এমনিতেও মুসলমানদের বিরোধীদের কোনো গুপ্তচরের প্রয়োজন ছিল না, কেননা মদীনায় বসবাসকারী মুনাফিকরা বেশ তৎপরতার সাথেই এই কাজ করত। যেমন, এই ঘটনার সময়ও মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল নীরব থাকে নি, বরং নিজের এক সহযোগীর মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ একটি পত্র খায়বারের ইহুদীদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল, মহানবী (সা.) তোমাদের দিকে আসতে যাচ্ছেন। নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করো এবং নিজেদের ধনসম্পদ নিজেদের দুর্গের অভ্যন্তরে নিয়ে রাখো আর নিজেরা মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধ করতে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও এবং তাঁকে দেখে একেবারেই ভীতত্রস্ত হবে না। তোমাদের সংখ্যা অনেক বেশি আর মুহাম্মদ (সা.)-এর লোকবল অনেক কম আর তাদের কাছে সামান্য কিছু অস্ত্র আছে।

(সীরাতুল হালবিয়া, পৃ: ৬৯, ৭২)

এই বিষয়ে যখন ইহুদীরা জানতে পারে, তখন তাদের নেতাদের একটি সভা হয় এবং সেই সভায় মতবিরোধের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিবরণটি এমন যে, খায়বারের ইহুদীরা যখন মুসলমান সেনাবাহিনীর আগমণের সংবাদ পায় তখন তারা একটি সভা করে যাতে ইসলামী সেনাবাহিনীর মোকাবিলার ব্যাপারে পরামর্শ করা হয়। এই বৈঠকে ইহুদীদের নীতি-নির্ধারকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। একটি দলের অভিমত ছিল, ইহুদীরা যেন দুর্গে আবদ্ধ হয়ে প্রাচীরের পেছনে থেকে যুদ্ধ করে, যেন মুসলমানরা পরিশেষে নিরাশ হয়ে অবরোধ তুলে নেয়। অপরদিকে খায়বারের বিখ্যাত বীর মারহাবের ভাই আবু যায়নাব প্রস্তাব দেয়, দুর্গে আবদ্ধ হয়ে মোকাবিলার পরিবর্তে বাহিরে ময়দানে গিয়ে মোকাবিলা করা হোক। কেননা ইতিপূর্বে মদীনার ইহুদীরা দুর্গে আবদ্ধ হয়ে মোকাবিলা করার ফলাফল প্রত্যক্ষ করেছে এবং তাতে মুসলমানদেরই বিজয় হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী দলটি তার এই প্রস্তাবকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, আমাদের দুর্গগুলো তাদের দুর্গসমূহ থেকে অনেক মজবুত। তৃতীয় একটি প্রস্তাব এর চেয়েও ধৃষ্টতাপূর্ণ ছিল, যা ইহুদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক দাম্ভিকতাপূর্ণ ছিল। আর সেটি খায়বারের সেনাদলগুলোর সেনাপতি সালাম বিন মিশকামের পক্ষ থেকে ছিল। তার বক্তব্য ছিল, আমরা স্বয়ং গিয়ে মদীনা আক্রমণ করি এবং নিজেদের সকল সঙ্গীদের সাথে নিয়ে মুসলমানদের ধ্বংস করে দিই। অধিকাংশ লোক এই মতামতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে। কিন্তু খায়বারের প্রধান নেতা কিনানা বিন আবিল হুকায়েক এর বিরোধিতা করে আর বলে, আমাদের দুর্গসমূহ মদীনার দুর্গগুলোর মতো নয়; আর তার অহংকার ও দম্ভের এই অবস্থা ছিল যে, সে বলতে থাকে, মুহাম্মদ (সা.) কখনোই আমাদের দিকে আসার সাহস করবে না। তবে সকল নীতিনির্ধারক এই বিষয়ে একমত হয়যে, একটি প্রতিনিধিদল প্রস্তুত করে আশেপাশের যুদ্ধবাজ সাহসী গোত্রগুলোর দিকে প্রেরণ করা হোক, যেন তাদের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য চাওয়া যায়।

অতএব চৌদ্দ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রস্তুত করা হয়, যার নেতৃত্বে কতিপয় রেওয়ায়েত অনুসারে খায়বারের শীর্ষ নেতা কিনানা স্বয়ং ছিল। এই প্রতিনিধিদল বনু আসাদ, গাতাফান এবং অন্যান্য গোত্রের কাছে যায় এবং খায়বারের এক বছরের উৎপাদনের অর্ধেক দেওয়ার বিনিময়ে সামরিক সাহায্য কামনা করে। বনু মুররা গোত্র দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে এভাবে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে বনু আসাদ ও বনু গাতাফানের ন্যায় যুদ্ধবাজ গোত্রগুলো এক হাজার সশস্ত্র সেনা সংবলিত সৈন্যদল তাৎক্ষণিকভাবে পাঠিয়ে দেয় এবং আরো চার হাজার সৈন্য সাহায্য হিসাবে প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এর প্রস্তুতি গ্রহণও আরম্ভ করে।

(ফতাহ খায়বার, পৃ: ৭৫-৭৭)

যাহোক, এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করব। এখন আমি কয়েকজন প্রয়াতের স্মৃতিচারণ করতে চাই। প্রথম স্মৃতিচারণ হলো মন্ডি বাহাউদ্দিনের মুকাররম মুহাম্মদ বখশ সাহেবের পুত্র মুকাররম মুহাম্মদ আশরাফ সাহেবের, যিনি সম্প্রতি ঐশী তকদীর অনুযায়ী মৃত্যু বরণ করেছেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ।তার তিন কন্যা ও ছয় পুত্র রয়েছে। তার এক পুত্র কাশেফ জাভেদ সাহেব বর্তমানে সেনেগালে রয়েছেন এবং ভারপ্রাপ্ত মিশনারী ইনচার্জ ও জামা'তের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এজন্য নিজ পিতার জানাযায় সেনেগাল থেকে এসে যোগদান করতে পারেন নি।

তার এই পুত্র যিনি মুরব্বী, তিনি লিখেছেন, খাকসারের পিতা একান্ত সহজ-সরল, পুণ্যবান, খোদাভীরু ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আহমদীয়াত ও খিলাফতের প্রতি তার পরম ভালোবাসা ছিল। নিজের পরিবারে তিনি একমাত্র আহমদী ছিলেন আর অধিকাংশ সময় এটিই বলতেন, আমরা যা কিছু পেয়েছি তা আহমদীয়াতের কল্যাণেই পেয়েছি। নিজের সন্তানদেরও সর্বদা আহমদীয়াত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ দিতেন। তিনি বলেন, তার দাদা মুহাম্মদ আযম সাহেব ১৯৬৮ সালের কাছাকাছি সময়ে সারগোধার একটি গ্রাম রয়েছে ভাবড়া, সেখান থেকে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। মুরব্বী সাহেব বলেন, সে সময় আমার পিতাও আহমদী হয়েছিলেন। তিনি বলেন, মায়ের দিক থেকে তিনি একমাত্র ভাই ছিলেন। আহমদী হওয়ার পর ম্যাট্রিক শেষে গ্রাম ছেড়ে মন্ডি বাহাউদ্দিনে শাহ তাজ সুগার মিলে চাকরি গ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত মন্ডি বাহাউদ্দিনেই বসবাস করেন। বড়ো বয়সে নিজ উৎসাহে কুরআন পড়া শেখেন আর এতটাই পরিশ্রম ও ভালোবাসার সাথে পড়েন যে, প্রত্যেক মাসে এক বা দুইবার অবশ্যই কুরআন খতম করতেন; রমযান মাসে দুই তিনবার খতম করতেন। দরিদ্রদের বিশেষভাবে সাহায্য করতেন। যে-ই তার কাছে আসত তাকে খালি হাতে ফেরত পাঠাতেন না। মুরব্বী সাহেব বলেন, তিনি আমাকেও বলতেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ওপর যে অনুগ্রহই করছেন তা তোমার ওয়াক্ফের কল্যাণে করছেন।

তার এক পুত্র মোবাশ্বের জাভেদ সাহেব বলেন, গত কয়েক বছর যাবৎ আমি সেক্রেটারি মাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আমার বাবা সর্বদা চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়মিত ছিলেন। আর যখনই তিনি পেনশন পেতেন তখন সবসময় এই প্রচেষ্টাই থাকত, পুরো বছরের চাঁদা একসাথে আদায় করে দিবেন। আর মৃত্যুশয্যাতেও তার এ চিন্তাই ছিল যে, আমার চাঁদা পরিশোধ হয়েছে কিনা। মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন তিনি এ বিষয়ে কৃতজ্ঞ ছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আমার সমস্ত চাঁদা প্রদানের তৌফিক দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন এবং (পরিবারের) সবাইকে ধৈর্য ও প্রশান্তি দান করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ কেনিয়ার নায়েব আমীর-২ হাবীব মোহাম্মদ শাতরী সাহেবের, যিনি মোহাম্মদ হাবীব শাতরী সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৫৬ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ- । মরহুম একজন মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে পিতা-মাতা ছাড়া স্ত্রী এবং তিন সন্তান রয়েছে।

কেনিয়া জামা'তের আমীর মাহমুদ তাহের সাহেব বলেন, তার পূর্বপুরুষরা ইয়েমেনের অধিবাসী ছিলেন আরতার পিতা হাবীব শাতরী সাহেব ১৯৮২ সনের আগস্টে বয়আত গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। আর মরহুম তার বড়ো পুত্র ছিলেন। পিতার বয়আত করার কিছুদিন পর তিনিও বয়আত গ্রহণ করেন আর আমৃত্যু বয়আতের অঙ্গীকার খুব ভালোভাবে পালন করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি মুমবাসায় গ্রহণ করেছেন। তিনি অত্যন্ত যোগ্য ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। স্কুলের পক্ষ থেকে কিছু সময়ের জন্য তাকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ফ্রান্সেও প্রেরণ করা হয়। খলীফাদের সাথে নিজের সাক্ষাতের ঘটনাবলিকে সর্বদা নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনাবলি হিসেবে বর্ণনা করতেন। চতুর্থ খলীফার সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন আর আমার সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন। বিভিন্নভাবে জামা'তের সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। মৃত্যুর সময়েও তিনি কেনিয়া জামা'তের ন্যাশনাল সেক্রেটারি তালীম ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

তিনি বলেন, তার সাথে আমার কুড়ি বছর যাবৎ পরিচয়। ওয়াকেফে যিন্দেগীদের অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং যে কাজই তাকে দেওয়া হতো তা অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করতেন; কখনো স্মরণ করানোর প্রয়োজন হয় নি। নিয়মিত নামায আদায়কারী, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলি ও নির্ধারিত সীমাসমূহের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল, চাঁদা প্রদানে নিয়মিত, উত্তম চরিত্রের অধিকারী, দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল, পিতামাতার আনুগত্যশীল এবং তাদের অধিকার প্রদানকারী, ছোটো ভাইবোনদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারী, বিজ্ঞ, পুণ্যবান, নিষ্ঠাবান এবং বিশ্বস্ত মানুষ ছিলেন। বড়ো বড়ো কোম্পানিতে উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও দিয়েছিলেন। পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাবসায়ী, রাজনীতিবিদ এবং সরকারী ও ধর্মীয় নেতাদের সাথে তার ওঠাবসা ছিল, কিন্তু কখনো নিজের আহমদী হওয়ার বিষয়টি গোপন করেন নি, বরং তা উপস্থাপন করে তবলীগও করতেন। আর এ কারণেই তার জানাযায় মুমবাসার বহু সংখ্যক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, ব্যাবসায়ী, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যক্তিত্ব অংশ গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুনএবং তার সকল আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠদের ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হলো মুকাররম আনুবী মাদিংগু সাহেবের, যিনি জিম্বাবুয়ের একটিস্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ-

তার পুত্র জিম্বাবুয়ে জামা'তের প্রেসিডেন্ট ইউসুফ আনুবী সাহেব লেখেন, প্রথম দিকে তিনি সুন্নী মুসলমান ছিলেন আর জামা'তের বিরোধিতা করতেন, কিন্তু তার হৃদয়ে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ছিলো। প্রথমে তিনি মালাভিতে ছিলেন। সেখানে যখন থাকতেন তখন তারঅনেক বিরোধিতা ছিল, পরবর্তীতে জিম্বাবুয়েতে স্থানান্তরিত হন। এখানে এসে ইসলামের প্রতি তার ভালোবাসার কারণে তিনি তার আশপাশের লোকদেরকে একত্রিত করেন আর যে অঞ্চলে বসবাস করতেন সেখানে বাজামা'ত নামাযের ব্যবস্থা করেন। তার হৃদয়ে এক উৎকণ্ঠা ছিল যে, আমি একজন প্রকৃত মুসলমান হব। যাইহোক, পরবর্তীতে জামা'তের সাথে তার যোগাযোগ হয়। সেখানে আমাদের মুরব্বী সাহেব আছেন সামিউল্লাহ্ সাহেব, তার সাথে দীর্ঘ ধর্মীয় আলোচনা হতে থাকে এবং অবশেষে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আর সেই এলাকায় তিনিই ছিলেন প্রথম আহমদী। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তার অনেক বিরোধিতাও হয়। আর যে লোকদের তিনি একত্রিত করেছিলেন তারাও তাকে ছেড়ে চলে যায়। তারা তার সাথে কঠোরতাও করেছে। এরপর তিনি সেখানে নামাযের জন্য যে সেন্টার তৈরি করেছিলেন তা ছেড়ে দিয়ে নিজের বাড়িতে পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে নামায এবং জুমআ পড়তে আরম্ভ করেন।

যাইহোক, তিনি মনোবল হারান নি; তবলীগ করতে থাকেন আর অনেক মানুষ তার কথা শোনেন, জামা'তের বার্তা শোনেন আর তার মাধ্যমে বয়আত গ্রহণ করে জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন। অনেক মানুষ তার আদর্শ দেখে জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নিজে আর্থিক কুরবানী করে তিনি জমিও ক্রয় করেছেন, যেখানে বর্তমানে জিম্বাবুয়ে আহমদীয়া জামা'তের প্রথম মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। তার ইচ্ছে এটাই ছিল যেন তার জীবদ্দশায় মসজিদ তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু যাইহোক, তার জীবদ্দশায় নির্মাণ সম্ভব হয় নি, এখন হচ্ছে। অত্যন্ত বিশ্বস্ত, স্পষ্টভাষী এবং সৎ মানুষ ছিলেন। মানুষের পারস্পরিক সমস্যাদি গভীর প্রজ্ঞার সাথে সমাধা করতেন। জামা'তের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পূর্বেও অধিকাংশ মানুষ তার প্রতি গভীর আস্থা ও ভরসা রাখতেন। তিনিও ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে দরিদ্রদের সাহায্য করতেন। সবসময় তার বাড়ি অতিথিতে সরগরম থাকত। জামা'তের প্রতি তার গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। সবাইকে জামা'তের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রাখার উপদেশ দিতেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে আট সন্তান রয়েছে। আর তার ছেলে, যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, জিম্বাবুয়ে জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন। তার এক পৌত্র কাসেম আনুবী জামেয়া থেকে পড়াশোনা করা জিম্বাবুয়ের প্রথম কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ (হিসেবে কর্মরত আছেন)।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন এবং তার বংশধরদের মাঝে জামা'তের শিক্ষা সর্বদা অব্যাহত থাকুক আর তারা পুণ্যকর্ম করতে থাকুন। (আমীন)

(আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৫)

❁****❁****❁****❁

১০পাতার পর.....

নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি খুব খুশি মনে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তার হাতে হাতকড়া পরানো ছিল। পথিমধ্যে একজন মওলানা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এত খুশি কেন এবং এত দ্রুত চলছেন কেন?' তিনি উত্তর দিলেন-

"এই হাতকড়াগুলো হাতকড়া নয়, বরং এটি মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মের অলংকার। আমি আমার প্রিয়তমের সুগন্ধি পাচ্ছি।'

(হযরত আব্দুল লতিফ সাহেব, লেখক- মওলানা দোস্ত মুহাম্মদ শাহিদ, পৃ: ৫৮)

প্রেমিকদের আহুতির এই আবেগ দেখ, রক্তের এই পথে উৎসর্গকে দেখ,
কুফরের বিরুদ্ধে একাকী সে দন্ডায়মান, আহমদীর ঈমানের চেতনাকে দেখ।

শ্রোতাবৃন্দ! হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বরকতের মাধ্যমে মহানবী (সা.-এর প্রেমিকদের এমন একটি আত্মত্যাগী জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যারা এখনও রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা ও ইসলাম ধর্মের প্রতি আনুগত্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে চলেছেন। খিলাফতে আহমদীয়ার সুশীতল ছায়ায় প্রতিটি আহমদীর বুকে রসুলের প্রতি প্রেমের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রয়েছে।

হে রসুলে আরবি (সা.) -এর ভালবাসার নিষ্ঠাবান প্রেমিকের দল! এই প্রেমের প্রদীপ কখনো নিভতে দিও নি। এই পথেই তোমাদের জীবন, এই পথেই তোমাদের মুক্তি। এই পথেই আল্লাহ্‌র সঙ্গে সংযোগ রয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন-

"সমস্ত মানবজাতির জন্য এখন আর কোনো রসুল বা শাফায়াতকারী নেই, কেবল হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করো, যেন তার প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা ও আনুগত্য রাখো। তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে কোন অবস্থায় তার উপরে বড় মনে করো না, যাতে আসামানে তোমাদের মুক্তিপ্রাপ্ত হিসেবে লেখা হয়।" (কিশতিয়ে নূহ)

তিনি আমাদের নেতা,যার থেকে সমস্ত জ্যোতি আসে, তার নাম মহম্মদ, তিনিই আমার প্রিয়তম। আমি সেই জ্যোতির জন্য নিবেদিত, আমি তারই হয়েছি, তিনিই সব, আমি কিছুই না। এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

****

মহান আল্লাহর বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সকলেই পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের আওতায় প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (আল-বাকারা: ২০৯))

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

মহান আল্লাহর বাণী

এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদে আত্মাকে বিক্রয় করিয়া দেয়, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ এইরূপ বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল। (আল-বাকারা: ২০৮)

দোয়াপ্রার্থী: Wasia Begum, Harhari, Murshidabad

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 13-20 March, 2025 Issue No. 11-12

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs.12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

মসীহকে অস্বীকারকারীদের দৃষ্টান্ত

মহানবী হযরত মহম্মদ (সা.)-এর তাকিদপূর্ণ নির্দেশ রয়েছে যে, যখন তোমরা ইমাম মাহদীকে পাও, তাকে আমার সালাম পোঁছে দিও। আর অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি বরফের পাহাড়ের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয় তবু যেও এবং তার হাতে বয়আত করো। তথাকথিত উলেমা সমাজ মহানবী (সা.)-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই নির্দেশকে উপেক্ষা করেছে এবং সালাম পোঁছে দেওয়ার পরিবর্তে তাঁর বিরোধিতায় অধঃপতিত হতে থেকেছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাদের উপমা দিয়েছেন এমন ভয়ানক ক্ষুধার্ত মানুষদের সঙ্গে, যারা নানান রকমের পুরস্কার (আহারাদি) দ্বারা পরিপূর্ণ দস্তরখানাকে প্রত্যাখ্যান করে অনাহারেই প্রাণ ত্যাগ করে। তিনি বলেন:

'পরিতাপের বিষয় হল চতুর্দশ শতাব্দীর বাইশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল আর আমার দাবির পর এত দীর্ঘ সময় ব্যতীত হয়েছে যে, আমার দাবির প্রারম্ভিক যুগে যারা মাতৃগর্ভে ছিল, আজ তাদের সন্তান-সন্ততিরা যুবকে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আপনারা আজও পর্যন্ত বুঝতে পারলেন না যে, আমি সত্যবাদী। কেবল বার বার একই কথা বলে যে, আমরা তোমাকে মানি না, কারণ হাদীসে লিপিবদ্ধ আছে যে, ত্রিশজন দাজ্জাল আসবে।

হে হতভাগা জাতি! তোমাদের ভাগ্যে কি কেবল দাজ্জালই রয়ে গেছে? তোমরা চতুর্দিক থেকে এভাবে বিধ্বস্ত হয়েছ যেভাবে রাত্রিকালে কোন আগন্তুকের পশু ফসল ক্ষেতের সর্বনাশ করে দেয়। তোমাদের আভ্যন্তরীন অবস্থারও যারপরনায় অবনতি ঘটেছে আর বহির্মুখী আক্রমণও চরমে পোঁছেছে। শতাব্দীর শিরোভাগে যে মুজাদ্দিদের আগমণ ঘটত, তোমাদের কথা মত হয়তো সে কথা খোদা তা'লা বিস্মৃত হয়েছেন যে, এবার শতাব্দীর শিরোভাগে একজন দাজ্জাল এসেছে । নাউযুবিল্লাহ। তোমরা ভূলুণ্ঠিত হয়েছ, কিন্তু খোদা তোমাদের খবর নেন নি। তোমরা বিদআতে নিমজ্জিত হয়েছ, কিন্তু খোদা তোমাদের উদ্ধার করেন নি। তোমাদের মধ্য থেকে আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হতে থেকেছে আর নিষ্ঠা ও পবিত্রতার লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। সত্য করে বল তো, তোমাদের মধ্যে এখন আধ্যাত্মিকতা কোথায় আর কোথায় খোদার সঙ্গে সম্পর্কের চিহ্ন? ধর্ম কি তোমাদের জন্য কেবলই কথার ধূর্ততা, অনিষ্টতামূলক বিবাদ ও বিদ্বেষের উন্মাদনা আর অন্ধদের ন্যায় আক্রমণ করার নাম? খোদার পক্ষ থেকে এক নক্ষত্রের উদয় হয়েছে, কিন্তু তোমরা সেটিকে সনাক্ত করলে না, তোমরা অন্ধকারের পথ অবলম্বন করলে। এই কারণে খোদা তোমাদেরকে অন্ধকারেই রেখেছেন।

এমতাবস্থায় তোমাদের এবং অন্যদের মাঝে পার্থক্য কিসের? কোন অন্ধ ব্যক্তি অন্ধদের দলে বসে কি একথা বলতে পারে যে, আমি তোমাদের থেকে ভাল অবস্থায় রয়েছি?

হে নির্বোধ জাতি! আমি তোমাদেরকে কিসের সঙ্গে তুলনা করব? তোমরা সেই সকল হতাভাগাদের ন্যায় যাদের গৃহের সন্নিকটে এক পরহিতৈষী একটি বাগান তৈরী করেছে যেখানে সে নানান রকমের ফলের গাছ লাগিয়েছে আর সেই বাগানের মধ্য দিয়ে একটি নহর প্রবাহিত হয়েছে যার পানি অত্যন্ত সুমিষ্ট। সে সেই বাগানে ছায়াদানকারী বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ রোপন করেছে যা হাজার হাজার মানুষকে রৌদ্র থেকে রক্ষা করতে পারে। অতঃপর সেই হিতৈষী ব্যক্তি সেই লোকদের আমন্ত্রিত করল যারা রৌদ্রে দগ্ধ হচ্ছিল আর যাদের কাছে কাছে কোন ছায়া ছিল না, আর কোন ফল ছিল না আর পানিও ছিল না যে তারা ছায়ায় বসে ফলাহার করে পানি পান করবে। কিন্তু হতভাগা মানুষগুলি সেই আমন্ত্রণকে প্রত্যাখান করল আর সেই রৌদ্রে তীব্র গরমে ক্ষুধা ও পিপাসায় প্রাণ ত্যাগ করল। এই কারণে খোদা তা'লা বলেন এদের স্থানে আমি অপর এক জাতিকে নিয়ে আসব যারা এই বৃক্ষরাজির সুশীতল ছায়ায় বসে সেই ফলগুলি গ্রহণ করবে আর সুস্বাদু পানি পান করবে। উদাহরণ স্বরূপ খোদা তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, 'যুল কারনাঈন' একদল মানুষকে রৌদ্রে পুড়তে দেখে। সূর্য আর তাদের মাঝে কোন বাধা ছিল না, সেই লোকগুলি যুলকারনাঈনের কাছে কোন সাহায্য চায় নি। এই কারণে তারা সেই কষ্ট ভোগ করতে থাকে, কিন্তু যুলকারনাঈনের সঙ্গে অন্য একটি জাতি মিলিত হয় যারা তাঁর কাছে শত্রুদের অশুভ হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাহায্য চায়। তাই তাদের জন্য একটি প্রাচীর তৈরী করা হয়। এই কারণে তারা শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পায়।

অতএব আমি সত্য সত্য বলছি যে, কুরআন শরীফের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সেই যুল কারনাঈন হলাম আমি যে প্রত্যেক জাতির শতাব্দী পেয়েছে আর রৌদ্রে গমণকারী হল সেই সমস্ত মানুষ, মুসলমানদের মধ্যে যারা আমাকে গ্রহণ করে নি আর পঙ্কিলময় প্রস্রবণ এবং অন্ধকারে বসে থাকা মানুষগুলি হল খৃষ্টান যারা সূর্যের দিকে মুখ তুলেও দেখে নি আর যে জাতির জন্য প্রাচীর তৈরী করা হয়েছে তারা হল আমার জামাত। আমি সত্য সত্য বলছি, এরা তারাই যাদের ধর্ম শত্রুদের অশুভ হাত থেকে রক্ষা পাবে। প্রত্যেক ভিত্তি যা মন্থর প্রকৃতির তাকে শিরক্ এবং নাস্তিকতা কুরে কুরে খাবে; কিন্তু আমার জামাত দীর্ঘায়ু লাভ করবে, যার উপর শয়তান ও তার দলবল প্রভুত্ব করতে পারবে না । তাদের যুক্তি প্রমাণ তরবারির থেকে বেশি তীক্ষ্ণ এবং বর্শার থেকে বেশি গভীরে প্রবেশকারী হবে। তারা কিয়ামত পর্যন্ত সকলের উপর জয়যুক্ত হতে থাকবে। "

(পরিশিষ্ট বারাহীনে আহমদীয়া, পঞ্চম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা: ৩১২)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, আঞ্জুমান তাহরীকে জাদীদ, আঞ্জুমান ওয়াকফে জাদীদ কাদিয়ানের প্রতিষ্ঠানগুলিতে মালি/ রাঁধুনি/নানবাঈ/কেয়ারটেকার/চৌকিদার হিসেবে খিদমত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি।

৪র্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের জন্য শর্তাবলী:

(১)প্রত্যাশীর বয়স ১৮ বছরে উর্দ্ধে এবং অনুর্দ্ধ ৪০ হতে হবে। * (২) শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত নেই, তবে শিক্ষিত প্রত্যাশীদের প্রাধান্য দেওয়া হবে। (৩) জন্ম-তারিখের জন্য স্বীকৃত শংসাপত্রের ফটোকপি দেওয়া আবশ্যক। (৪) ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে সমস্ত আবেদন পত্র জমা পড়বে সেগুলি বিবেচিত হবে। (৫) কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে। (৬) ইন্টারভিউ এ উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। (৭) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। (৮)প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

(নোট: লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ -এর দিনক্ষণ পরে জানানো হবে।)

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন-

(সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

Office: 01872-501130,

Mobile: 9888232530, 09682627592

ই-মেল: diwan@qadian.in

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir